অবিশ্বাস্য

অমরনাথ ব্রহ্মচারী

সাহিত্য প্রকাশ

৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা—৭০০০০৯

৺গিরীন্দ্র সিংহ

সুদূরতমেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই—

বহুরূপে দেবতা তুমি
তান্ত্রিকসাধনা ও তন্ত্রকাহিনী
সম্মোহন
অশরীরী
যক্ষিণী
সে আসে
আবার আমি
জন্মান্তর রহস্য
আজও যা ঘটে
অজানার আঙিনায়
জীবনের ওপার থেকে
নীলসায়রে
কে ডাকে আমায়
সে কি এলো ফিরে
অচিন পরশ
সীমান্তের সুর
যোগিনী (আসন্ন প্রকাশ)

১

দিনের বেলায়ও রাতের অন্ধকার নেমে রয়েছে জায়গাটায়। বাইরে থেকে বুঝতে পারা যায়নি অত। অন্য গাঁয়ের ভিতর দিয়ে এখানে আসবার সময় অনেকেই গাড়োয়াল হিমালয়ের এই সিন্দুরি বনভূমির অনেক কথাই শুনিয়েছে। এটা রাক্ষুসে অরণ্য। এখানকার রডোডেনড্রন পাইন আর চীর গাছগুলো একেবারে মানুষখেকো দানবদের বংশধর। গাছ সেজে ঘন জঙ্গলের ফাঁদ পেতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সব। এখনো কত নর-কঙ্কাল এখানে ওখানে পড়ে রয়েছে ভিতরে।

গ্রামবাসীরা আমাদের—আমি আর আমার সঙ্গী তিনজন বন্ধুর—হাত ধরে ধরে অনুরোধ করেছে—দূর পথের ব্যবধান ঘোচাতে এ-জায়গাটা বেছে নেওয়া যেন না হয় মোটে। নিলে বাবুসাবদের বিপদ অনিবার্য। এ বনটা আশ্চর্যভাবে সবুজের নেশা ধরায় পথিকের দু'চোখে। ভিতরে আসবার অদম্য বাসনা উন্মত্ত করে তোলে তাকে। সংযত করে রাখতে পারে না কিছুতেই নিজেকে। নিজের অজান্তেই অরণ্যের ভিতরে চলে আসে পথিক। তারপর চোখের সামনে দেখতে থাকে বেরোবার শত-সহস্র পথ। যে পথেই পা বাড়াক, সেই পথই টেনে নিয়ে যায় ভিতরে—অনেক ভিতরে। অরণ্যের গহন থেকে আরো গহনে।

গাঁয়ের লোকদের ভীতু ভেবে ওদের কোন কথাই বিশ্বাস করি নি। বরং উপেক্ষা করেছিলুম আমরা। ওদের কথাতেই জায়গাটা দেখবার কৌতূহল জেগে উঠেছিল আরো আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে।

আমরা এসেছি গ্রামবাসীদের সেই রাক্ষুসে জায়গাটায়। গাছের ফাঁক দিয়ে দিয়ে প্রবেশ করেছিল ভিতরে। চতুর্দিকে সবুজের সমারোহ দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি সকলে। এখানে না এলে, প্রকৃতি শিল্পীর নিপুণ হাতে গাছগাছালি সাজানোর সুন্দর ছবি দেখার একটা অনাস্বাদিত আনন্দ উপভোগ করতে পারতুম না আমরা। যত চারদিক দেখছি তত যেন নিজেদেরই ভুলে যাচ্ছি। দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি সবাই।

আচমকা চমক ভাঙল আমাদের রেফারীর হুইসিলের মত তীব্র আওয়াজ কানে এসে বাজতে। একটানা আওয়াজটা সকলের কানের পাশে পাশে ঘুরছে। কিসের আওয়াজ এ বনভূমির নিস্তব্ধতা ভেঙে খান-খান করে দিল, বুঝে উঠতে পারলুম না কেউ।

বেরোবার জন্য প্রস্তুত হয়ে, বেরোবার পথে পা বাড়ালুম সবাই। চলছি তো চলছিই। হঠাৎ খেয়াল হল, অরণ্যের অন্ধকার রাজ্যের গহনে তলাতে শুরু করেছি যেন আমরা ধীরে ধীরে।

টর্চের আলো ফেললুম, বেরুবার অগুণতি পথ দেখতে পেলুম চোখের সামনে। বেছে নিলুম অন্য পথ। এখানেও আগের ভুলই করলুম। টর্চ নিবোতে ঘন অন্ধকারই দেখলুম শুধু। বাইরের আলো নজরে পড়ল না কারো। ছেড়ে দিলুম এপথও। ধরলুম আর একটা পথ আবার।

এইভাবে এক এক করে বেশ খানিকক্ষণ পথ পরিবর্তনের পালা চলল আমাদের। এপথ ওপথ সেপথ ধরে বেরুবার বৃথা চেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে শেষে বসে পড়লুম চীরগাছ তলায়।

অরণ্যের অন্ধকূপে বসে আছি চার জনে বেশ বুঝতে পারছি। গ্রামবাসীদের কথা মনে পড়ছে এবার। ওদের সাবধান-বাণী বেজে উঠছে আমাদের নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে।

খানিক থেমে থাকার পর হুইসিলের মত আওয়াজটা কানের পরদা ফাটিয়ে তুলতে লাগল আবার।

কিছুক্ষণ আগের দেখা বনভূমির সৌন্দর্যের নেশা কেটে গেছে আমাদের চোখ থেকে। তার বদলে বনভূমির বিভীষিকার রূপটাই ফুটে উঠছে কেবল চোখের সুমুখে। বেরুবার ব্যর্থ চেষ্টাটাই হতাশা এনে দিয়েছে বেশী করে। হতাশার বোঝা যন্ত্রণা স্নায়ুগুলোকে নিস্তেজ করে ফেলছে ক্রমে। মনোবল হারিয়ে ফেলছি আমরা। একটা অজানা আশঙ্কা পেয়ে বসছে সকলকে।

বসে বসে ভাবছি আমি। অনন্তকাল ধরে এখানে—এই গাছতলায় বসে বসে ভাবলে, কেউ আসবে না। উদ্ধার করে পথ দেখিয়ে নিয়েও যাবে না কেউ। সঙ্গের খাবার ফুরিয়ে যাবে ক'দিন বাদে। নতুন করে খাবার যোগান দিতে আসতে দেখতে পাব না এখানে কাউকে।

এইভাবে আত্মীয়-স্বজন থেকে চিরবিচ্ছিন্ন হয়েই দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে চলে যেতে হবে হয়তো আমাদের একদিন। প্রিয়জনরা নিরুদ্দেশের ডায়েরীতে আমাদের নাম ক'টা লিখে রাখবে শুধু।

গ্রামের লোকের কথাগুলো মনে-কানে ঘা মারছে থেকে থেকে। মনের ভয় চোখে ছেঁকে ধরেছে কিনা—জানিনে। তবে মনে হচ্ছে সত্যিই যে দেখছি চারপাশের গাছগুলো এক একটা নর-কঙ্কাল। ওদের হাড়ের হাতগুলো উঁচু থেকে আমাদের গলার দিকে এগিয়ে আসছে আস্তে আস্তে।

রুদ্ধনিশ্বাসে দেখছি আমি—আমি কেন—আমরা চারজনেই এই দৃশ্য দেখছি একসঙ্গে। অসহায় মনে অসহ্য মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করছি আমরা প্রত্যেকে। এমনই অবস্থা আমাদের যে, হাতের কাছে টর্চ থাকা সত্ত্বেও জ্বালতে পারলুম না চারজনের একজনও। অবশ হাত নড়াচড়া করতে পারল না একটুও।

চার বন্ধুর ঠিকুজি-কুষ্ঠিতে নাকি জাতকের নির্ভীক-দুঃসাহসী প্রকৃতির বর্ণনা করা হয়েছে প্রতি ছত্রে ছত্রে। তবে এ ভয় এ দুর্বলতা কেন? নিজের কাছে নিজেকেও বিস্ময় ঠেকছে। আলো জ্বালবার শেষ চেষ্টা করেও পাথরভারী হাত দু'খানা তুলতে পারলুম না একটুও আমি।

টর্চের আলো জ্বলল না বটে, কিন্তু সেই মুহূর্তে দূরে লণ্ঠনের আলো চোখে পড়ল আমাদের। অবাক চোখে দেখছি আমরা লণ্ঠনটা এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আবার দৃষ্টিপথে ভেসে উঠছে। লণ্ঠনটা যেন উঁচুনীচু হয়ে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে।

অদ্ভুত কাণ্ড! শূন্যে ভাসতে ভাসতে লণ্ঠন আসছে। এল। একেবারে সামনা-সামনি এসে থামল। ছাইরঙের সালোর-মির্জাই পরা পাহাড়ী লোকটা লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে আমাদের দিকে চেয়ে। এতক্ষণ লোকটার পরনের পোশাকের রঙ অন্ধকারে মিশে ওকে আমাদের চোখে অদৃশ্য করে রেখেছিল।

এসময় এই ভাবে এই নিরালা জায়গায় আগন্তুক এল কি করে, কেন এল—প্রশ্ন দুটো জিবের ডগায় এসে থমকে গেল আগন্তুকের স্পর্শে। প্রত্যেককে হাত ধরে ধরে সযত্নে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হাতের ইঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করতে বলল।

আগন্তুককে অনুসরণ করে চলেছি আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত।

মানুষটাকে প্রথমে দেখে কেমন একটা সংশয় জেগে উঠেছিল মনে। শরীরী, না অশরীরী? ওর উষ্ণ স্পর্শে সংশয়ের মেঘ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছল নিমেষে। রক্তমাংসের মানুষকেই কাছে পেয়েছিলুম। মনে সাহস এসেছিল। কিন্তু মানুষটাকে দেবতা-প্রেরিত ভাবতে গিয়েও, ভাবতে পারি নি। বিশ্বাস করতে পারিনি ঠিক মত। কেবলি মনে হতে লাগল, এক বিপদ থেকে উদ্ধার হতে

গিয়ে আর এক বিপদের ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছি না তো আমরা শেষে! লোকটা হয়তো বনে ঢোকবার আগে দেখে থাকবে আমাদের। কাছে কিছু মালসাম আছে ভেবে নিজের খপ্পরে নিয়ে গিয়ে ফেলছে বুঝি। বনের মধ্যে সুযোগ পেয়েও কোন হামলা করতে সাহস করেনি। ঢোকবার মুখে ওকেও নিশ্চয় দেখেছে কেউ—সেই ভয়ে।

অবিশ্বাসের ওপর অবিশ্বাস আর নানা রকমের অকাট্য যুক্তি তোলপাড় করছে ভিতরে আমার। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, লোকটার এমনই একটা প্রবল আকর্ষণ যে, মনের মধ্যে যাই হোক না কেন—ওকে অনুসরণ করে আমরা ঠিকই এগিয়ে চলেছি। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে পড়তে পারছি নে, থামতে পারছি নে।

আমরা থামতে না পারলে কি হবে—লোকটা নিজেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ চলতে চলতে। লণ্ঠনটা পাশে ঘোরাল। মৌন মুখ খুলল, বলল, এরকম কঙ্কাল এপাশ ওপাশ খুঁজলে পাওয়া যাবে আরো।

সর্বশরীর শিউরে উঠল আমার। বন্ধুদেরও অবস্থা আমারই মত। লোকটার বিশেষ করে কঙ্কাল দেখানোর উদ্দেশ্য কি—বুঝলুম না। সন্দিগ্ধ মন আমার আরো সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। মনে হল, স্নায়ুগুলো সতেজ হয়ে উঠেছিল—নিস্তেজ করে দেবার জন্য—মনোবল ফিরে পাচ্ছিলুম—ভেঙে দেবার জন্য নিশ্চয়ই এই পন্থা অবলম্বন। শিকারকে দুর্বল করে রাখলে শিকার করা সহজ-সাধ্য চতুর শিকারীর।

চলতে শুরু করল আবার আগন্তুক।

এবারে পা চলার সঙ্গে মুখ চলাও আরম্ভ হল তার।

—জায়গাটা ভয়ানক। অনেকেই এখানে এসে ফিরে যেতে পারে নি আর। এসব জানত না শঙ্করলাল। সরল প্রাণেই এসেছিল এলাহাবাদ থেকে পূর্বপুরুষদের গাড়োয়ালের জন্মভিটে দেখতে।

বাধা দিয়েছিলেন তার বাবা। মা-হারা ছেলেকে মায়ের কথা তুলে বাঁধতে চেষ্টা করেছিলেন। তিমলিগাঁও দেখতে যাবার জিদ থেকে সরাতে চেষ্টা করেছিলেন। মৃত মা-ঠাকুমার ফটোর সামনে ছেলেকে দাঁড় করিয়ে অতীত কাহিনী শুনিয়েছিলেন নতুন করে।

ঠাকুর্দার রক্তের কণায় কণায় অজানাকে জানবার আহ্বান ছুটোছুটি করে বেড়াত। বাঁধা-ধরার মত ঘরে বেশীদিন স্থির হয়ে থাকতে পারতেন না একদম। সবার অজান্তেই একা নতুন পাহাড় নতুন বনভূমি দেখবার জন্য নিশুতি রাতে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যেতেন।

এই ভাবেই একদিন অজানা পথে পাড়ি দিয়ে নিরুদ্দেশ হলেন তিনি। বছরের পর বছর ঘুরল, তবু কোন খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। দেখা মিলল না তাঁর আজ অবধি।

হয়তো আর এ জগতে নেই তিনি—একথা মৃত্যু অবধি মেনে নেন নি ঠাকুমা। বেঁচে আছেন—এই ধারণা মনে পুষে, এয়োতির চিহ্ন ছিন্ন না করে সধবার সাজেই সেজে থাকতেন তিনি দিনরাত। ওই সাজেই চলে গেলেন।

বাবাকেও বাইরে বেরুবার নেশা থেকে নিবৃত্ত করেছিল শঙ্করলালের মা। মরণের সময় প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিয়েছিলেন তিনি স্বামীকে—ছেলেকে বাইরে যেতে দেওয়া যেন না হয়। শ্বশুরের কথা মনে করেই এটা করিয়েছিলেন তিনি।

মাথা নীচু করে বাবার কথাগুলো শুনল শঙ্করলাল। সংসারের এসব ইতিহাস আগে থেকেই জানা। দশ বছর বয়সে শুনেছে ঠাকুমার কাছে, তারপর মায়ের কাছে। তারপর পূর্ণ যৌবনে এই বাইশ বছর বয়সে শুনল আবার বাবার মুখে।

বাবার ছলছলে চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল বার কয়েক। মন টলল না, গলল না। জাগল না কোন মমতা। নির্ভীক গলায় জানাল, এটা তো নিছক অ্যাডভেঞ্চার নয়—এটা আদি পুরুষদের জন্ম-ভিটে দেখা। দুটোকে এক করে দেখা ঠিক নয়।

শঙ্করলালের কাছে বাবার সিদ্ধান্তটা ঠিক নয় মনে হতেই, রাত-দুপুরে চুপিসারে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল ঠাকুর্দার মতই পথে।

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে, একটু থামল আগন্তুক। দম নিল বোধহয়। এবারে আমাদের দিকে মাঝে মাঝে তাকাতে লাগল বলতে বলতে।

আগন্তুক বলছে আর চলছে।

আমরা চলছি আর শুনছি। শুনতে ইচ্ছা করছে না। তবুও কথাগুলো কানে যাচ্ছে আপনা হতেই। মনে হচ্ছে, এসব অপ্রাসঙ্গিক। স্রেফ ভয় ধরানোর জন্যই বানিয়ে বানিয়ে কাহিনীর মালা গাঁথছে লোকটা।

উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠছে আগন্তুকের কণ্ঠস্বর।

—সামনের এই নদীটা তখনো বয়ে চলেছিল এইভাবে। তখনো এর বুকের ওপর ওই রকমেরই বড় বড় গাছ দুটো লম্বালম্বি ভাবে পড়েছিল। গাছের সাঁকোর ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে বনভূমিতে এসে পৌঁছেছিল শঙ্করলাল।

ঘুরতে ঘুরতে এ-জায়গাটার কাছ বরাবর আসতেই যে উদ্দেশ্যে আসা ভুলে গেছল একেবারে। তার বদলে এই জায়গাটার মোহই পেয়ে বসেছিল তাকে।

বনের ভিতর প্রবেশ করে, শোভা দেখতে দেখতে আত্মহারা হয়ে গেছল। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি শুরু হতে সচেতন হয়ে উঠল, প্রমাদ গণল। গাছের পাতা বেয়ে বেয়ে বৃষ্টির বরফজলের বড় বড় ফোঁটা পড়ছে মাথায় গায়ে। বাতাস বইছে শন শন করে. থরথরিয়ে কেঁপে উঠছে বনভূমি। মনে হচ্ছে মহাকালের কবলে পড়ে নাকানি-চুবানি খাচ্ছে। নাভিশ্বাস উঠছে।

স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না কোন গাছের তলাতেই শঙ্করলাল। কেবলি এটা ছেড়ে ওটা, ওটা ছেড়ে সেটার তলায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। আকাশের তলায় গাছের ছাদ নড়ছে বড্ড বেশি। গাছগুলোর মাথা ভেঙে ভেঙে ছাদের জোড় খুলে গিয়ে শঙ্করলালের মাথায় পড়ে বুঝি এখুনি।

মৃত্যুত্রাসে বুদ্ধিভ্রম হল শঙ্করলালের। দিশেহারা হয়ে ছুটতে লাগল চতুর্দিকে। বনভূমি থেকে বেরিয়ে যাবে প্রাণ বাঁচাতে। নদীর ধারে এসে দাঁড়াল। খরস্রোতা নদী তখন ভীষণ মূর্তি ধরেছে। ওর দুর্দান্ত বেগ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে কোথায় গাছদুটোকে। উধাও হয়েছে গাছের সাঁকো। বিচ্ছিন্ন হয়েছে দুপারের সংযোগ। ছুটল বিপরীত দিকে। বিস্মিত চোখে দেখল, বিরাট ধস নেমেছে। যাবার পথ বন্ধ।

ছুটল অন্যদিকে। এবারে বনভূমির মায়াজাল-বিছানো ভয়ঙ্কর পথে পা বাড়াল। পথের পর পথ পরিবর্তন করে করে ভুলেব পর ভুলই করতে লাগল শঙ্করলাল। বাইরে বেরুতে গিয়ে ভিতরের দিকেই এগুতে লাগল। অন্ধকারের মৃত্যুগহ্বরে এসে হাজির হল শেষে।

পা টলছে, মাথা ঘুরছে। বসে পড়ল ঘাসের ওপর। সাইরেন পোকা-গুলো হুইসিলের মত তীব্র তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলতে লাগল।

সপসপে ভিজে পোশাক পরে বসে বসে বৃষ্টির জলে ভিজছে শঙ্করলাল। কাঁপুনি ধরছে সর্বশরীরে। এইভাবে যন্ত্রণাভোগ চলল ঘণ্টাখানেক—বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত। এক যন্ত্রণাভোগ শেষ হতে না হতে নতুন যন্ত্রণাভোগ শুরু হল আবার। বুকে হাঁটু গুজে জড়সড় হয়ে বসেছিল। বসতে পারল না আর এক মুহূর্তও। ঘাসের ওপরই শুয়ে পড়তে বাধ্য হল প্রবল জ্বরের আক্রমণে। দুদিন ধরে চলল এই জ্বরের দাপট শঙ্করলালের ওপর। জোটেনি ওষুধ, জোটেনি সেবা, জোটেনি কোন পথ্য। অর্ধচেতন অবস্থায় শঙ্করলাল দুচোখ বুজে-বুজেই দেখেছে অতীত, শুনেছে অতীতের কথা।

ছোটবেলায় একবার এই রকম জ্বর হয়েছিল তার। তখন মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে দেবতার কাছে প্রার্থনা করতেন মা—শঙ্করলাল তাঁই বাঁচাই

দেঁও।—ঠাকুর, শঙ্করলালকে রক্ষে কর। বাঁচিয়ে তোল। এ ধরনের প্রার্থনা ঠাকুমাকেও করতে শুনেছে। বাবাকেও করতে শুনেছে।

জনমানবহীন জায়গায় আজও যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে শঙ্করলাল ওদের তিনজনের মিলিত কণ্ঠস্বরের প্রার্থনা। তিনজনের দুজন নেই—মা-ঠাকুমা। আছেন কেবল বাবা। কিন্তু মৃত জীবিত—সকলেরই কথা কানে বাজছে থেকে থেকে—বাঁচাই দেঁও।

যে দুজন নেই পৃথিবীতে, তাঁদের কথা শুনছে কেমন করে! যিনি রয়েছেন তিনিও তো এখান অনেক দূরে। তবে? হয়তো তার বাঁচবার প্রবল ইচ্ছে'ই অতীতের প্রার্থনার সুরে কথা কয়ে উঠছে। প্রার্থনায় কথা কয়ে উঠলেও কে শুনবে, কে-বাঁচাবে তাকে এ-যাত্রা? বাঁচাবার কেউ নেই। শোনবার কেউ নেই।

শঙ্করলাল যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। মনের চোখে দেখছে শুধু মৃত্যুর উদ্যত খড়্গ। এগিয়ে আসছে তার দিকে ধীরে ধীরে। এই সময়টায় তার পরমায়ু শেষের কথা নিশ্চয় লেখা আছে বিধির বিধানে। অসাড় হয়ে আসছে সমস্ত দেহটা শঙ্করলালের। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে বুঝি এখুনি। দুচোখ খুলতে শেষ চেষ্টা করছে। পারছে না। ভিতরে অন্ধকার, বাইরে অন্ধকার। ডুবছে অন্ধকারের অতল তলে শঙ্করলাল। ডুবছে ডুবছে ডুবছে—

বলদেওরামের দরজায় কে যেন ধাক্কা দিল জোরে। চারপাইয়ে শুয়েছে কিছুক্ষণ বলদেওরাম। আধ-ঘুমন্ত অবস্থা তখন। ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। দরজার কাছে এল। খুলল। দেখল একটা লোক চলে যাচ্ছে পিছু ফিরে তাকাতে তাকাতে।

লোকটার যন্ত্রণাকাতর দুচোখ ডাকছে তাকে। চলতে চলতে ও দুমড়ে পড়ছে। কুঁকড়ে যাচ্ছে। একটু থেমে ওই অবস্থাতেই আবার চলছে আর চোখের ইশারায় বলদেওরামকে ডাকছে। যে দিকটায় যাচ্ছে সেটা বনভূমির পথ।

চকিতের মধ্যে ঘরে গিয়ে লণ্ঠন নিয়ে এল বলদেওরাম। তার মনে হতে লাগল, নিশ্চয় বনভূমির ভিতর কিছু একটা ঘটেছে। লোকটার সঙ্গীর কোন বিপদ আপদ হয়ে থাকবে হয়তো। ওর চলনের ধরন-ধারণ দেখে মনে হয় অসুস্থ। অসুস্থ হয়েও তাকে ডাকতে এসেছে সঙ্গীর জন্যই। কথা কইবার দাঁড়াবার একটুও অবকাশ নেই তাই। দ্রুত পায়ে এগিয়েই যাচ্ছে।

অনুসরণ করে চলেছে বলদেওরাম।

বনভূমির মধ্যে প্রবেশ করল লোকটা। প্রবেশ করল বলদেওরামও। বেশ খানিক এগুবার পর লণ্ঠনের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেল, সামনের মানুষটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল একটু দূরে। ছুটে এল কাছে সে। দেখল পড়ে রয়েছে ঘাসে মুখ গুঁজে। গায়ে হাত দিয়েই চমকে উঠল। পুড়ে যাচ্ছে গা জ্বরে।

সেবা-শুশ্রূষায় ওকে সুস্থ-সচেতন করে তোলবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। কিছুক্ষণ বাদে ঘাড় উঁচু করে মুখ তুলতে দেখল। দেখল চোখ খুলে তাকাতে। দুচোখের কাতর আকুতি দেখে বলদেওরাম জানতে চাইল, কার জন্য ডেকে এনেছে তাকে এখানে। বিস্মিত ক্ষীণ কণ্ঠের জবাব শুনল—উত্থানশক্তিরহিত আজ ওর দুদিন ধরে।

আশ্চর্য হয়ে গেল বলদেওরাম। এই চোখ-জোড়াই ডেকেছে তাকে বার বার···এটা অতি সত্যি। অথচ মানুষটা কিছুই জানে না। এ এক অজ্ঞাত রহস্য।

বলদেওরাম উদ্ধার করে নিয়ে এল লোকটাকে নিজের শ্লেটপাথরের ঘরে। যাকে নিয়ে এল ঘরে—সে-ই শঙ্করলাল।

পরিষ্কার হিন্দীতে শঙ্করলাল-কাহিনী শোনাতে শোনাতে শ্লেটপাথরের ডেরায় এনে চারপাইয়ের ওপর বিশ্রাম করতে বলল আমাদের চারবন্ধুকে আগন্তুক। মৃদু হেসে জানাল—এটাই বলদেওরামের ডেরা। নিজের পরিচয় দিয়ে অবাক করে দিল আমাদের—সে-ই বলদেওরাম।

এরপর বনে আটকে পড়া মানুষের উদ্ধার করার বাকি কাহিনীটুকু শোনাতে লাগল বলদেওরাম আমাদের সামনে কাঠের বড় বাক্সটার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে।

আগে অনেকেই বনের ভিতর আটকে পড়ে মরেছে। তাদের কঙ্কাল এখনো দেখতে পাওয়া যায়। আগে যেত না কোনদিন কাউকে উদ্ধার করতে বলদেওরাম বনভূমিতে। শঙ্করলালের ব্যাপার নিয়েই বনের মধ্যে যাওয়া শুরু তার।

শঙ্করলালের পর থেকে আজ অবধি যে-কেউ বনের ভিতর আটকে পড়েছে—দেখেনি সে কাউকে শঙ্করলালের মত আগে। দেখেনি কোন বিপন্ন লোকের করুণ চোখের আহ্বান। শুধু একটা দারুণ অস্বস্তি অনুভব করেছে ভিতরে। বনভূমি প্রবল আকর্ষণ করেছে যেন তাকে। ঘরের বার করে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে যেখানে গভীর অরণ্যে আটকে পড়েছে পথহারা কোন হতভাগ্য মানুষ।

২

জায়গাটার কাছ বরাবর আসতেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল আমার সর্বাঙ্গ।

মোটর চলছে। খাড়াইয়ের পর খাড়াইয়ে উঠছে। গাছপালা ভরা সবুজ পাহাড়ের গা কেটে কেটে আঁকা-আঁকা উঁচু-নীচু রাস্তা করা হয়েছে গাড়ি যাবার। সেই পথ ধরেই এগুচ্ছে আমাদের গাড়ি। যত এগুচ্ছে, বুকের ভিতর ঢিপ-ঢিপও করছে তত আমার। দু'জনের উষ্ণ নিশ্বাস পড়ছে আমার দু'দিকে! ডাইনে-বাঁয়ে। ডানদিকে বসে আছে তরুণীটি, বাঁদিকে তরুণ। ওদের দু'জনের মাঝখানে আমি।

মেয়েটি বলছে যখন, ছেলেটি থেমে যাচ্ছে। চুপচাপ একেবারে। আবার ছেলেটি যখন মুখ খুলতে শুরু করছে, মেয়েটি নির্বাক হয়ে যাচ্ছে তক্ষুণি। পালা করে বলছে দু'জনে। আমি নিবিষ্ট মনে শুনছি ওদের কথা। শুনছি আর ভাবছি!

আমার ভাবনার সঙ্গে এক একবার এক একটা দৃশ্য ভেসে উঠছে যেন চোখের সামনে স্পষ্ট। আমি দেখছি, একটা গাড়ি পাহাড়ী ঘোরানো পথ বেয়ে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে ক্রমে। গাড়িটার ভিতর শিরাণে। কি নিদারুণ অবস্থা ওর! কি করুণ চাউনি ওর দু'টি নীল চোখের। ও চোখ জোড়া আর্তনাদ করছে। ডাকছে সকলকে তাকে বাঁচাবার জন্য। ইয়াসোর খপ্পর থেকে মুক্ত করবার জন্য।

শিরাণের হাত-পা নাড়বার উপায় নেই একটুও। ইয়াসো পিছমোড়া করে বেঁধে রেখেছে তাকে। শক্ত দড়ি কেটে কেটে বসে গেছে হাতে-পায়ে। মুখ বেঁধেছে রুমালে, যাতে একটা শব্দও উচ্চারণ করতে না পারে। কেন কে জানে, শুধু চোখ-নাকের ওপর হামলা করেনি।

নাকটা বন্ধ করে দিলে হয়তো দম আটকে মরে যাবে, তাই খোলা রেখেছে। তার কর্মফলের সাজা পাক অন্তত খানিকটা, দগ্ধে দগ্ধে মরুক। দু'চোখ খুলে মেলে দেখুক, কি অবস্থা হতে চলেছে তার! আতঙ্কে আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়ুক।

অস্থির হয়ে পড়ছে শিরাণে। ভীতি বিহ্বল চোখে তাকাচ্ছে চতুর্দিকে। ড্রাইভারের পাশের লোকটার দুচোখ দিয়ে আগুন ঝরছে। এই দিকেই মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। পলকহীন চোখে তাকে দেখছে। একটু নড়বার চেষ্টা করলে লোকটার উঁচিয়ে ধরা ছোরাটাও নড়ে উঠছে। পালাবার চেষ্টা করেছ কি, নির্ঘাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে না জেনো, হুঁশিয়ার!

এক পাশে ইয়াসো একপাশে তার বন্ধু। ওদের দু-জনের ছুরির ফলার মতো সতর্ক দৃষ্টি ওর দু'চোখে বিঁধে বিঁধে ক্ষতবিক্ষত করছে। এদের তিনজনের এক জনের কাছ থেকেও উদ্ধার হবার—বাঁচবার কোন সাহায্যই পাওয়া যাবে না।

তবুও চোখের অসহায় আবেদন জানাচ্ছে এদেরই তিনজনের চোখে সুন্দরী শিরাণে। শিরাণের চোখের মোহে বুঝি ইয়াসোর মন টনছিল, গলছিল। তাই বন্ধুর পকেটে খপ করে হাত পুরে দিয়ে রুমালটা টেনে বার করে নিল। মোটা রুমালটা আরো পুরু করল দু'পাট করে। শিরাণের দু-চোখ ঢেকে দিয়ে, কোণা দু'টো পিছনের দিকে টেনে নিয়ে জোর করে গিঁট বাঁধল।

নিশ্চিন্ত হল ইয়াসো। কোন রকমের দুর্বলতা আর আসতে পারবে না কারো শিরাণের ওপর। সমস্ত কার্য সমাধা করতে পারবে ইয়াসো নির্বিঘ্নে।

নির্বিঘ্নেই সব কিছু করতে পারত যদি না সুরজিত সিং গাড়ি নিয়ে অনুসরণ করত তাদের গাড়ির। এ-পথে এ-সময় সুরজিত সিংয়ের আসবার কথা নয়। সব জেনেশুনে ভালোভাবে বিচার আচার করা হয়েছে ক'দিন ধরে। তারপর এই ভোরের দিকে শিরাণেকে গাড়িতে তোলা হয়েছে। একথা সুরজিত সিংকে বলবার-জানাবার কেউ নেই ত্রিভুবনে একজন ছাড়া। সে বলতে পারে না জীবন থাকতে। একাজের সে-ই প্রধান হোতা। তারই স্বার্থ বেশী। শিরাণেকে নিয়ে ব্যথা বেদনা তারই বেশী। ধরা পড়লে যেন সুরজিত সিংয়ের হাতে শিরাণেকে ছেড়ে দেওয়া না হয় কিছুতেই। ওর প্রাণ থাকতে নয়। এ কড়া নির্দেশ দিয়েছে সে-ই।

তবে বলল কে?

শিরাণে নিজে? না, তার হাত-পা-মুখ বাঁধার আগের মুহূর্তেও জানতে পারেনি সে এসব ষড়যন্ত্রের কোন ব্যাপারে। ঘুমন্ত অবস্থাতেই হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়া হয়েছে তার ওপর। ঘুম ভেঙেছে। একটু ধস্তা-ধস্তি করাই সার হয়েছে তার। মুখ দিয়ে কথা ফুটতে দেওয়া হয়নি একটাও। আগে থেকেই হাত দিয়ে মুখ চেপে রাখা হয়েছিল।

তিনজনের সঙ্গে কোন রকমেই পেরে ওঠেনি সে। তবু প্রাণপণে যুঝেছিল। দু'চোখের কোণ দিয়ে বড় বড় জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়েছিল টসটস করে। যারা কাছে ছিল, মমতা জাগেনি তাদের অন্তরে। জেগেছিল ভয়। প্রাণের নয়, কাজ পণ্ড হয়ে যাবার। দেরী হলে, কেউ এসে পড়লে, কেউ জানতে পারলে সমূহ বিপদ তাদের। যে টাকা খেয়েছে, সে তো খেয়েছেই। যে টাকা পেয়েছে ফেরৎ দিতে হবে। যা পাবার কথা, তা আর পাবে না। সুতরাং ওদের ভয় পাওয়া স্বাভাবিক, তাড়াহুড়ো করা স্বাভাবিক।

এই দলের ইয়াসোও। তার পাথর-কঠিন মনের আর দুর্দান্ত প্রকৃতির খ্যাতি চতুর্দিকে। তার কাছে আইন-কানুনের কোন বালাই নেই। নেই কোন ধর্মাধর্মের জ্ঞান বিচার। তাকে দেখলে একশো হাত দূর থেকে সরে পড়ে মানুষ, সামনে আসা তো দূরের কথা। তার অপরাধের সাক্ষী দেয় না কেউ। তাকে বাঁধবার কেউ নেই। আটকাবার কেউ নেই।

ইয়াসো নির্মম-নির্দয়।

ইয়াসো নামটা ছুটে বেড়ায় বাতাসে বাতাসে অহর্নিশি। বুক কাঁপানো ত্রাস ধরায় ছেলে-বুড়ো, সকলের মনে। এতে ইয়াসোর গর্ব বাড়েই যেন। সময় সময় একান্তে বসে ভাবে ইয়াসো, তার জুড়ি নেই কেউ। তার মতো হতে অনুগতদের এখনো অনেক-অনেক দেরী।

ইয়াসো লোকের নির্যাতন দেখলে, আনন্দে ফেটে পড়ে। বিশাল শরীর নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচতে থাকে। রক্ত জল করা এক অদ্ভুত আওয়াজ বেরুতে থাকে মুখ দিয়ে সে-সময়। কারো কান্না দেখলে হেসে গড়িয়ে পড়ে একেবারে। থামতে বেশ সময় লাগে।

এহেন ইয়াসো থেকে থেকে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছিল শিরাণের চোখের জল দেখে। নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। শিরাণেকে গাড়িতে তোলা পর্যন্ত এ অবস্থার পরিবর্তন হয়নি কোন। ওর গুণমুগ্ধ বন্ধু আর অনুগত, দু'জনেই ওকে দেখে অবাক হয়েছে। তারা নাচতে দেখল না হাসতে দেখল না এই প্রথম ইয়াসোকে। বরং ইয়াসোর দু'চোখ চিকচিক করে উঠতেই দেখল যেন। ওস্তাদের মুখের ওপর কোন কথা বলার কোন সাহস নেই ওদের। তাই নির্বাক মুখে ওস্তাদের পূর্বের নির্দেশ পালন করল ওরা। ইয়াসোর সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসল।

গাড়ি চলছে, সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই ইয়াসোর। লক্ষ্য কেবল শিরাণের দিকে। শিরাণের চোখের জলের ক্ষীণধারা বোধহয় ওর পাথুরে বুকের মাঝ-

খানে খাঁজ কেটে কেটে বয়ে চলেছে। শিরাণেকে মুক্তি দেবার একটা প্রবল ইচ্ছে পেয়ে বসছে মাঝে-মাঝে। নিজেকে সংযত করে নিচ্ছে তখুনি। টাকা খেয়েছে জান কবুল করেছে। কাম বরবাদ হতে দিতে পারবে না ইয়াসো কখনো। খুনে রক্ত মাথার ভিতর টগবগ করে ফুটে উঠছে নতুন করে আবার। শিরাণেকে উদ্ধার করতে আসে যদি কেউ, ধড়ে মাথা থাকবে না তার আর। এ-ভাবটা ধরে রাখবার চেষ্টা করেও পারছিল না। কাল হয়েছিল শিরাণের মায়াবী চোখ।

চোখ বেঁধে দিয়ে ভেবেছিল নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু পারল না। পিছন থেকে গাড়ির আওয়াজ কানে আসতেই চমকে উঠল। মুখ ফিরিয়ে গাড়ি আসতে দেখে রাগে সর্বশরীর রি-রি করে উঠল। শিরাণের ওপর থেকে মোহ-মমতা চলে গেল নিমেষে। মনে হল চেনা গাড়িই অনুসরণ করছে। সুরজিত সিংয়ের গাড়ি।

চিঠি দিয়ে বা লোক পাঠিয়ে কোন খবরই যে দিতে পারে না সুরজিত সিংকে শিরাণে, এটা ভালো ভাবে জেনেও, ইয়াসোর সমস্ত আক্রোশ গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শিরাণের ওপর। মনে হল মেয়েটাকে শেষ করে দেয় এখুনি। ডান দিকের খাদে দিফু নদীর বুকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিষ্কৃতি পায়। সুরজিতের চোখের সামনেই এই কাজ করবে সে। এক ঢিলে দুই পাখী মারবে। একজন মরবে, আর একজন মরে বেঁচে থাকবে।

পিছনের মোটরটা এগিয়ে আসছে। গতি বাড়িয়ে দিয়েছে সুরজিত। ইয়াসোদের গাড়ির গতিও বাড়িয়ে দেওয়া হল। দুটো গাড়ির দূরত্বের ব্যবধান রইল খুব সামান্যই। নিঃসন্দেহ হবার জন্য পিছনের কাঁচে চোখ রেখে ভালো করে দেখে নিল ইয়াসো, সত্যিই সুরজিত গাড়িতে আছে না চোখের ভ্রম। কোন মানুষই আজ পর্যন্ত তার সামনা-সামনি হতে দুঃসাহস দেখায়নি—সুরজিত তো নগণ্য লোক!

দারুণ ধাক্কা খেল যেন একটা ইয়াসো। সত্যিই সুরজিত। সঙ্গে নেই কেউ। একলাই গাড়ি চালিয়ে আসছে। ভয়-ডর নেই প্রাণে। ইয়াসোর শক্তির মর্যাদাকে অপমান করার জন্য, অবহেলা করার জন্য দুঃসাহস দেখাতে আসছে একলা। ঠিক আছে। উচিত মতো শিক্ষা পাবে ও। মর্মান্তিক শিক্ষা দিয়ে দেবে ওকে ইয়াসোই। বিদ্যুৎ চমকের মতো শিক্ষা দেবার মতলব খেলে গেল মাথার ভিতর চকিতে। ঘনঘন উষ্ণ নিশ্বাস পড়ছে ইয়াসোর। বুকখানা ফুলে উঠছে। মাথায় খুন চেপেছে বুঝি ওর। মাথার রক্ত চোখেও নেমেছে। রক্তজবা চোখদুটো চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে বার বার শিরাণের আপাদমস্তকে।

এগিয়ে আসছে সুরজিতের গাড়ি। আগের দ্বিগুণ গতি বাড়িয়েছে এবার সুরজিত।

মস্ত সুযোগ এসে গেছে ইয়াসোর কাছে। পাহাড় ফাটানো পৈশাচিক অট্টহাসি হাসল ও। হাসি থামল। রাস্তার বাঁ দিকটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিল একবার। চোখের ইশারায় ড্রাইভারকে কি যেন নির্দেশ দিল। মন্থর গতি হয়ে এল গাড়ির। ইয়াসোর চোয়াড়ে মুখখানা বীভৎস হয়ে উঠল। দু'ধারের চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে উঠল আরো। সুরজিতের গাড়িখানা হুমড়ি খেয়ে পড়বেই এ-গাড়িটার ওপর। রুখতে রুখতেই ঘটে যাবে এই কাণ্ড। চক্ষের নিমেষে ঘটে যাবে অপ্রতিরোধ্য দুর্ঘটনা!

শিরাণেকে গাড়িতে রেখে দিয়ে বাঁদিক ঘেঁষে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল ইয়াসোর সঙ্গে সকলে।

চালকবিহীন গাড়িটা নিয়ে চলেছে অসহায় শিরাণেকে। শিরাণে বুঝতে পারল না, জানতে পারল না কোথায় গাড়িখানা নিয়ে যাচ্ছে তাকে। যাচ্ছে নিশ্চিত মৃত্যুগহ্বরের দিকে—এটাও না।

প্রথম থেকেই অসম্ভব ভয়ে ভয়ে সমস্ত স্নায়ু তার অবসন্ন। অর্ধ-অচেতন অবস্থায় পড়েছিল। মৃত্যুর চিন্তা ছিল না মোটে। বাঁচবার আকাঙ্ক্ষাই ছিল প্রবল। তাই মৃত্যুর চিন্তাটা মাথার মধ্যে আসেনি একদম। নিজের অজ্ঞাতেই যে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষাকষি করতে চলেছে, তা-ও তার অনুভূতিতে জেগে উঠছে না একবারের জন্য।

কারো ভাবা না-ভাবার ওপর নির্ভর করে অপেক্ষা করে না কোনদিন দুর্ঘটনা। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। দুর্ঘটনা ঘটল! ভয়ানক ভাবেই ঘটল।

পিছন থেকে এ-গাড়িটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সুরজিতের গাড়ি।

প্রথম গাড়িটা ধাক্কা খেয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উল্টেপাল্টে গড়াতে গড়াতে দিফু নদীর বুকে গিয়ে পড়ল। আর দ্বিতীয়টা ঘুরে গিয়ে ধারের গামাড়ি গাছটায় ধাক্কা খেতেই দরজা খুলে গেল আপনা থেকেই। বাঁদিকে ছিটকে পড়ল সুরজিত।

গাছ-গাছালির আড়াল থেকে হাসতে হাসতেই বেড়িয়ে এল ইয়াসো। মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে তার। ব্যর্থ হয় না তার কোন চেষ্টা। তার কোন মতলব ভুল করেও বিশ্বাসঘাতকতা করেনি আজ অবধি তার সঙ্গে।

এক ঢিলে দুটো পাখি মরেছে। নিজেকে নিঃসন্দেহ করার জন্য দু'জনকে

দেখার স্পৃহা জেগে উঠল। শিরাণেকে সুরজিতকে। শিরাণে তো বেঁচে নেই নিশ্চয়ই। সুরজিত? যেভাবে আঘাত লেগেছে, ছিটকে পড়েছে, তাতে দেহে প্রাণ না থাকারই কথা। থাকলে ওর মুমূর্ষু অবস্থাতেই ধড় থেকে শির নামিয়ে শেষ করে দেবে একেবারে নিজে হাতেই ইয়াসো।

ইয়াসো এগিয়ে এসে সুরজিতের শিয়রে দাঁড়াল। দেখে মনে হচ্ছে মৃত। অভ্রান্ত দৃষ্টি তার। বাঁ দিকের বুকের ওপরটা কাঁপছে না একটুও। হৃৎপিণ্ডটা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে।

সুরজিতকে ঘিরেই শিরাণের মায়ের চিন্তার অন্ত ছিল না।

নিজের জীবনে নিদারুণ ঘা খেয়েছিল মা। সে ক্ষত শুকোয়নি তার। ক্ষতর যন্ত্রণা ভোগ করছে সর্বক্ষণ। মেয়ের মুখের দিকে তাকালে যন্ত্রণাটা চতুর্গুণ বেড়ে যায়। একান্ত মনে চায়নি মা—সারাজীবন ধরে তার নিজের মতো যন্ত্রণা ভোগ করুক মেয়ে। তার মতো অভিশপ্ত জীবন যেন মেয়ের না হয় কখনো। এইটাই চেয়েছিল। তাই সুরজিতের চোখের বাইরে মনের বাইরে সরিয়ে রাখতে বলেছিল ইয়াসোকে। মেয়েকে সরানোর মূলে মা নিজেই। কোহিমায় নিয়ে যেতে মতলবও দিয়েছিল ইয়াসোকে। মেয়ের সুখের জন্য যা করতে চেয়েছিল—তাতে কৃতকার্য হতে না পারলে—মা হয়েও বলেছিল—ভবিষ্যতে দুষ্টক্ষতর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য ওকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে কোন দ্বিধা বোধ করা যেন না হয়।

মিটেছে শিরাণের মায়ের আশা। সরেছে শিরাণে, সরেছে সুরজিত। দ্বিগুণ ইনাম পাবে ইয়াসো শিরাণের মায়ের কাছ থেকে।

ইয়াসোর মনের আনন্দ মুখের হাসিতে উপচে পড়ছে। পাশের সঙ্গীরা ওর হাসি দেখে ওর মনোভাব আঁচ করে তারাও হাসছে।

হাসবে সব শুনে শিরাণের মা-ও। তার ভিতরের আগুন-জ্বলা ক্ষত ঠাণ্ডা হবে এবারে কিছুটা। ইয়াসোকে তারিফ করবে ওর কাজ হাসিল করার পন্থা শুনে, গূঢ় রহস্য জেনে। মেয়েটার মুখ আর দেখতে হবে না তাকে কোন দিন।

মেয়ের মুখ দেখলেই বেশী করে মনে পড়ত বিদেশী সেনাবিভাগের অফিসারের কথা। মুখ-চোখ অবিকল তারই মতো। তারই সঙ্গে অবাধ মেলামেশার ফসল মেয়েটা।

অফিসার এসেছিল এক সন্ধ্যেয় দেশী মদ মধু কিনতে। সন্ধ্যের সেই

বিকিকিনির সময় আলাপ হল তার সরল ক্রীশ্চান নাগা যুবতীর সঙ্গে। যুবতী মধু বিক্রি করছিল কাঠের ঘরটায় বসে। যুবতীর মিষ্টি আচার-ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিল অফিসার। এরপর থেকে আসতে শুরু করেছিল রোজ সন্ধ্যেয়। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েই মেলামেশা আরম্ভ করেছিল। মেয়ে কোলে আসতে আনন্দে করেছিল ওর নামকরণ—শিরাণে।

বড হয়ে উঠতে লাগল শিরাণে দিন দিন। কিন্তু শত অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও এগিয়ে আসেনি আর শিরাণের মায়ের কুমারী নাম খণ্ডন করতে। নিজের প্রতি-শ্রুতি পালন করেনি। শেষ পর্যন্ত শিরাণের মাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল একদিন বিশ্বাসঘাতক। সেই থেকে কোন খোঁজ খবর নেয় নি আমরা-মেয়ের।

মা বেশ বুঝতে পেরেছিল, মেয়ের জীবন তার দুর্ভোগের খাতেই বইতে শুরু করেছে। বুঝতে পারছে না মেয়ে। প্রত্যেক সন্ধ্যেয় আসছে সুরজিত। শিরাণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠছে। শিরাণেকে বিয়ে করবেও নাকি বলেছে ছেলেটা। সুরজিতের মধ্যে দেখেছে অফিসারকে মা। দেখতে পেয়েছে মেয়ের মধ্যে নিজেকে। তাই আঁতকে উঠেছে ভয়ে মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

নিজের জীবন কাহিনী শুনিয়েছে, বাপের কীর্তিকলাপের কথাও জানিয়েছে। তবু সুরজিতের দিক থেকে প্রেমের উজান ঘোরাতে পারেনি মেয়ের মনের। সেনাবিভাগের অফিসার নয় সুরজিত। ব্যবসায়ী। মেয়ের এই বক্তব্য যুক্তি মেনে নেয়নি মা। সুরজিতের ভিতর অফিসারকে দেখার অভ্যাস ছাড়ে নি। তলায় তলায় সুরজিতের কাছ থেকে শিরাণেকে বিচ্ছিন্ন করার পথ বার করতে চষ্টা চলেছিল প্রাণপণে। পথের নিশানা পেয়েছিল। জানিয়ে দিয়েছিল ইয়াসোকে।···

মায়ের কথামত কার্য সমাধা করেছে ইয়াসো। সুরজিতের দেহটাকে ফেলে রেখেই সঙ্গীদের নিয়ে চলল অদম্য কৌতূহলে শিরাণের মৃতদেহ দেখে মাকে খবর দিতে।

শিরাণের গাড়ির কাছে এসে বিস্মিত হতবাক হয়ে গেল ইয়াসো। চোখকে অবিশ্বাস করতে, ইচ্ছে করছে। যা দেখছে সত্যি নয়। সত্যি হতে পারে না।

বার চারেক দু'চোখ রগড়ে নিয়ে দেখছে তো দেখছেই। দু'চোখের পাতা নড়ছে শিরাণের। আস্তে আস্তে চোখ খুলছে। গাড়িটার সীটে যে ভাবে ফেলে রাখা হয়েছিল. ঠিক সেইভাবেই পড়ে আছে শিরাণে। তারতম্য হয়নি একটুও।

শিরাণে দেখেছে তোবড়ানো গাড়িটার ভিতর থেকে ইয়াসোকে। ওর উদভ্রান্ত দৃষ্টি। কি হয়েছে ওর ও দু'চোখে জানে না। বোঝে নি।

অগভীর নদীর জলে একটা বিরাট পাথর খণ্ড গাড়িটার চাকা চারটেকে আটকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। আর সেই গাড়ীটার ভিতর অক্ষত দেহে বেঁচে পড়ে রয়েছে শিরাণে।

এ কেমন করে হল ?

ইয়াসোর অস্থি থেকে মজ্জা থেকে দেহের প্রতিটি রোমকূপ থেকে এই একই প্রশ্ন উঠতে লাগল বারবার। কোন লোক এসে পড়ার আগেই সঙ্গী বন্ধু শিরাণেকে নিঃশেষ করে ফেলবার জন্য এগুচ্ছিল তাড়াতাড়ি, বাধা দিল ইয়াসো। ধারালো চকচকে ছোরাটা কেড়ে নিল হাত থেকে। মরণের মুখে পড়েও যে মরল না তাকে কেউ মারতে গেলে বাধা দেওয়াই উচিত ইয়াসোর।

ইয়াসো যেন কিরকম হয়ে যাচ্ছে। ওর পাথুরে বুকে ভাঙন ধরছে। ভেঙে টুকরো হয়ে যাচ্ছে। উদ্ধার করল শিরাণেকে। নিজে কঠিন বাঁধন খুলে দিল শিরাণের। সঙ্গীরা অবাক চোখে দেখল ওকে। দেখল ও নতুন মানুষ। নতুন কাজ করল।

এরপর সুরজিতের দেহটার কাছে আসতে বিস্ময়ের পর বিস্ময় ঘিরে ধরেছে ইয়াসোকে। যাকে মৃত ভেবেছিল, সে মৃত নয়, অচেতন। আগে যা দেখেছিল ভুল। বাঁ দিকের বুকের কাছটায় মৃদু কম্পন দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট। ইয়াসোর প্রথমের দৃষ্টিভ্রমই ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

'অনেক চেষ্টা করে জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিল ইয়াসো সুরজিতের' স্টিয়ারিং ধরে ঘাড় ফিরিয়ে হাসতে হাসতে কথা বলল ইয়াসো এতক্ষণ বাদে। জানাল সুরজিতের তাদের পিছনে আসার অদ্ভুত ব্যাপারটাও।

শিরাণেকে ইয়াসো সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একথা সুরজিত শোনে নি কারো মুখে। এ সম্বন্ধে সে কোন কিছুই জানে না। রেডিওর প্রভাতী অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে তখন। চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। কাপটা ঠোঁটে ঠেকিয়েছে সবে। এমন সময় রেডিওর গানটায় যেন শিরাণের কান্নার সুর শুনতে পেল। পরে কান্নার সুরটা যেন বাইরের দিক থেকে ভেসে আসতে লাগল। বাইরে বেরিয়ে কান্নাটা আবার আরো দূর থেকে আসছে মনে হল। মোটরে উঠে বসল ও—কান্নার সুরের অনুসন্ধান করবে বলে। শিরাণের কান্নার সুর শুনে শুনেই সে এগুচ্ছিল।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছিল ইয়াসো। তাদের গাড়িতে মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে তখন শিরাণে। অথচ কান্নার সুর শুনতে পাচ্ছিল সুরজিত!

আমি তাকালুম আমার ডান পাশে শিরাণের মুখের দিকে। মৃদু মৃদু হাসছে ও। এবারে বাঁ পাশে চোখ ফিরল। সুরজিতের চোখ-মুখও হাসছে।

গাড়ি চলছে আমাদের। দুর্ঘটনার জায়গাটা অতিক্রম করল ধীরে ধীরে।

গাড়ির গতি বাড়ছে আবার একটু একটু করে। আমাদের চারজনেরই মুখ বন্ধ এখন। শিরাণে সুরজিতের পর ইয়াসোও বলেছে। সম্পূর্ণ হয়ে গেছে কাহিনী।

ওরা মনে মনে কোন কথা কইছে কি না তা আমি জানিনে। দেখে বুঝতে পারছিনে কিছু। আমি কিন্তু মনে মনে কথা কইতে লাগলুম। ভালো লাগছিল খুব আমার। সেদিনের ঘাতক আজ দেহরক্ষী চালক। সেদিনের মরণ পথের যাত্রী দু'জন আজ স্বামী-স্ত্রী।

৩

মিলিণ্ডা! মিলিণ্ডা! মিলিণ্ডা! মিলিণ্ডা!

নামটা মুখ থেকে মুখে কান থেকে কানে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। একসঙ্গে অনেকগুলো চাপা গলার ফিস ফিস আওয়াজ সাপের মতো হিসহিস গর্জন করে উঠছে-যেন। শুনছি আমরা। আমরা বলতে আমি আর ডেভিড সাহেব।

ডেভিড সাহেব তখন অফিস ঘরে বসে। টেবিলের এদিকে ওর সামনা-সামনি চেয়ারে আমিও বসে আছি। মুক্তো তোলা সম্বন্ধে বেশ আলাপ আলোচনা চলছিল দু'জনের মধ্যে। ছেদ পড়ল হঠাৎ মিলিণ্ডা নামটা কানে আসতে। সাহেব দাঁড়িয়ে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। আমিও কিছু না বুঝেই ওর দেখাদেখি উঠে দাঁড়ালুম।

অবাক বিস্ময়ে দেখলুম সাহেবের লাল মুখখানা সাদাটে হয়ে গেছে নিমেষে। দু'চোখে ভয়ের ছায়া। দুর্দান্ত দুঁদে মানুষটা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। পায়ে পায়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে এলুম আমিও। বাইরে পাতায় ছাওয়া দালানটায় দাঁড়িয়ে উত্তর দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। আমি ওর দৃষ্টি অনুসরণ করলুম।

মিলিণ্ডা আসছে। মিলিণ্ডার দৃষ্টি সাহেবের ওপরেই। সাহেবের আপাদমস্তক দেখতে দেখতে এই দিকেই এগিয়ে আসছে মন্থরগতিতে। পাশে দাঁড়িয়ে আমি। কোন লক্ষ্য নেই তার আমার ওপর।

আশপাশের মাঝি-ডুবুরিরা যে যেখানে যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল, স্থাণুর মতো সেই অবস্থাতেই সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সত্রাসে একবার সাহেবের দিকে আর একবার মিলিণ্ডার দিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন। আমার চোখ জোড়া সাহেব থেকে শুরু করে উপস্থিত সকলের মুখের ওপর চক্কর দিয়ে আসছে এক একবার।

যত কাছাকাছি এগিয়ে আসছে মিলিণ্ডা তত সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো বুকটা ওঠানামা করছে প্রত্যেকের। মায় সাহেবের পর্যন্ত। দ্রুত থেকে দ্রুত, আরো দ্রুত হয়ে উঠছে ক্রমশ। মানুষগুলোর ভিতরে একটা সর্বনাশের আশঙ্কার ঝড়-তুফানের তাণ্ডব চলছে যেন। ওদের মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছে তাই। ভিতরের তুফানটা বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে।

আচমকা তুফানটা যেন থেমে গেল চোখের পলকে। রুদ্ধ নিঃশ্বাস সবার। রুদ্ধবাক সবার। সাহেবের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মিলিণ্ডা।

মিলিণ্ডা সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছি আমি সাহেবের মুখে আর এই দক্ষিণ ভারতের তুত্তিকোডি বন্দরের স্থানীয় লোকদের মুখে। মিলিণ্ডা রহস্যময়ী কুহকিনী ডাইনী। ওর অসাধ্য নেই কিছু। সমুদ্রের রাক্ষুসে হাঙর-গুলোর মতো ওরও ভিতরটায় ওই রকম অজস্র হাঙর কিলবিল করে বেড়াচ্ছে অহর্নিশি। তাদের খাদ্য জোগাড় করতে আসে ও এখানে মুক্তো তোলার সময়। ওর পেটের মধ্যে কখন যে কাকে যেতে হবে হাঙরের খোরাক হয়ে তা বিধাতাই বলতে পারেন একমাত্র।

ওর ছ'চোখে কি সর্বনেশে যাদু আছে কে জানে। দূরের মানুষকে অজগরের নিঃশ্বাসের আকর্ষণের মতো কাছে টানে। তারপর চোখেরই মায়াজাল বিস্তার করে এমন ভাবে আটকে ফেলবে মানুষকে যে ওর কাছ থেকে দূরে পালানো তো দূরের কথা—নড়াচড়া করবার ক্ষমতা থাকবে না একটুও কারো। বক্তাদের এই বক্তব্যটা অন্তত মিলেছে আমার কাছে। তার প্রমাণ পাচ্ছি। স্বচক্ষে দেখছি। সত্যিই অতগুলো মানুষ নজরবন্দী মিলিণ্ডার কাছে।

আমি অবশ্য সাহেব ছাড়া একবারের জন্যও মিলিণ্ডাকে অন্য কারো দিকে তাকাতে দেখছি নে। না তাকিয়েও অন্যদের বিনা হাতকড়া শেকলে, বিনা লোকলস্করে পুতুলের মতো চুপচাপ দাঁড় করিয়ে রাখতে পারে যে মেয়ে, সে মেয়ে যে সে নয়, বেশ বুঝতে পারলুম।

বোঝার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও একটা অনাগত বিপদের আশঙ্কা ঘিরে ধরল। মিলিণ্ডার বিষয়ে সব ক'টা শোনা কথা যদি এইভাবে ফলে যায় তাহলে তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটবে। বিপদের সীমা-পরিসীমা থাকবে না আর কারো। প্রাণ নিয়েও টানাটানি হতে পারে কারো না কারো। প্রমাদ গণলুম আমি। কি কুক্ষণে না এসে পড়েছি গোঁয়াতুর্মি করে, সমস্ত মিথ্যে ভেবে।

সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিলিণ্ডা। চাউনির ধরন দেখে মনে হচ্ছে, ওর ছ'চোখ কোন একটা প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব চাইছে সাহেবের নিষ্পলক নীল চোখ ছটোর কাছে। মিলিণ্ডার কপালে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠছে। ভুরু কুঁচকে বার বার দেখছে সাহেবকে।

সাহেবের ছ'চোখে প্রাণের সাড়া নেই যেন। একেবারে পাথুরে চোখ। থরথরে হয়ে উঠছে মিলিণ্ডার দৃষ্টি। ওর তীক্ষ্ণদৃষ্টির ফলা বিঁধছে পাথুরে

চোখ দুটোয়, ঘা মারছে। ঘা মেরে মেরে খানখান করে ভেঙে ফেলবে বুঝি এখুনি। ভিতরটা দেখতে চাইছে। গোপন রহস্যের সত্যি হদিস পেতে চাইছে। ডুবুরির মতো সাহেবের মনের গহনে নেমে একটা সত্যিকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে বার করে নিয়ে আসতে চাইছে। দেখবে, তাকে বিশ্বাস করতে পেরেছে কিনা সাহেব এতদিনেও।

সেদিনে যা ঘটেছিল, তার সত্যি ব্যাপার সাহেবের না জানার কথা নয়। মিলিগুাই জানিয়ে দিয়েছিল সমস্ত। বোঝবার সুবিধের জন্য বলেছিল ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে। তবুও সাহেব বলেছিল, আই ডোণ্ট নো ডোণ্ট বদার মী এগেন। বুট জুতোয় শক্ত পায়ের দুম দুম আওয়াজ তুলে সমুদ্রের ধার থেকে অফিস ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিল।

সেদিনও এই দৃষ্টি মেলে ধরেছিল মিলিগুা সাহেবের চলার পথে। ইংরিজী কথা বুঝতে না পারলেও মুখ দেখে ধরতে পেরেছিল, বিরক্ত হয়ে উঠেছে সাহেব তার ওপর, উদ্দেশ্য সফল হয়নি তার।

সাহেবের এই দুর্ব্যবহারে অগ্রাহ্যে মিলিগুার কিন্তু নিজের বদ্ধমূল ধারণা মন থেকে সরেনি এক চুলও। নিজের ধারণাটাকে যথার্থ প্রতিপন্ন করতে পরদিন ভোর না হতেই সাহেবের অফিসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

ঘর থেকে বেরুবার মুখে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিল সাহেবকে, টমাস অন্দয়াল··। টমাসই সেই লোক। সব শুনেও আমাকে এত অবিশ্বাস করছ তুমি কেন?

তামিল কথা সাহেব যে না বোঝে তা নয়, কিন্তু মিলিগুার কোন কথাই কানে নেয়নি। গম্ভীর মুখে গটগট করে বেরিয়ে গেছিল পাশ কাটিয়ে।

ফিরে এসেছিল মিলিগুা নিজের ডেরায়। সে বছরে আর কোন বিপত্তি ঘটেনি বন্দরে, ঘটেনি সমুদ্রের জলে। ঘটেছিল অসম্ভব কাণ্ড বছর ঘুরতে, মুক্তো তোলার সময় আবার ফিরে আসতে।

মিলিগুার অন্য রূপ দেখে চমকে গেছিল সকলে। ভয়ে আঁতকে উঠেছিল। নিকষ কালো মেয়েটার সব কিছুই কালো। সাক্ষাৎ মৃত্যুবিষের একটা ঘড়া যেন ও। সমুদ্র মন্থনে রত্ন উঠেছিল আর বিষ উঠেছিল শোনা যায়। মেয়েটা সমুদ্রতীরে জন্মেও রত্ন হয়ে উঠতে পারে নি। সমুদ্রের অপগুণ, যত বিষ সমুদ্র ছেঁকে শুষে নিয়েছিল বুঝি ওর সর্বশরীরে। ঘন নীল বিষই ওর রংটাকে কালচে করে দিয়েছে বোধ হয় তাই।

এমন ভয়ঙ্কর মেয়ে এর আগে ভূভারতে দেখেনি কেউ কখনো। এ মেয়ের চোখে আগুনের ফুলকি। নিশ্বাসে আগুনের হলকা। বেশীক্ষণ

দাঁড়ানো যায় না সামনে। ইস্পাত কঠিন মানুষও গলতে থাকে যেন। অসহ্য জ্বালা ধরতে থাকে সমস্ত দেহে।

এহেন মিলিণ্ডার সামনে দাঁড়িয়ে ডেভিড সাহেব।

সাহেবের মুখের ওপর থেকে চোখ ফেরাল মিলিণ্ডা সমুদ্রের দিকে। কি যেন কি ভাবল খানিক। তারপর নিজের মনেই কি সব বিড়বিড় করে বলতে বলতে চলে গেল।

সচেতন হয়ে উঠল সকলে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। পাথর মূর্তির সাহেবকে আবার রক্তমাংসের মানুষ মনে হতে লাগল। একটু আগের ভীরু সাহেব বরাবরের দুঃসাহসী রাশভারী লোক হয়ে উঠল আবার। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, পাগলীটা দু'বছর ধরে নাস্তানাবুদ করছে আমাদের।

কি নাস্তানাবুদ করছে, তা আমি জানি। মুক্তো তোলা বন্ধ করে দেয় সমুদ্রের জলে একটা বিভীষিকার রাজ্য তৈরি করে। বন্দুক ডিনামাইট সেপাই, কোন কিছুই বাগ মানতে পারে না তার নির্মম খেলাকে।

এ খেলার রহস্য ভেদ করতে এসেছে গুণিন। এসেছে যাদুকর জ্ঞানী-বিজ্ঞানী আর সাধু সন্ত ওঝা। আরো কত রকমের কত কিছু জানা লোকের যে আবির্ভাব ঘটেছে সমুদ্রের উপকূলে তার ইয়ত্তা নেই। অনেক রকম করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেও মিলিণ্ডাকে একটা সাধারণ মেয়ে ছাড়া অন্য কিছু বলার সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি আজ পর্যন্ত কেউ। নির্মম খেলার কোন রহস্যই ভেদ করতে পারেনি। সকলেই এই সাধারণ মেয়েটাকে সমুদ্রের উপকূলে এলে কেমন হয়ে যেতে দেখেছে। দেখেছে কি বীভৎস মূর্তি হয়ে ওঠে ওর। দেখা যায় না চোখে। অতি অবিশ্বাসী অতি নির্ভীকের মনেও ভয় ধরে। মেয়েটা যেন সম্পূর্ণ পাল্টে যায় একেবারে। প্রকৃতিতে তো বটেই, আকৃতিতেও মনে হয়। মুখ-দেহ সব যেন অন্য মানুষের। গলার স্বরটাও কি রকম শোনায় কানে। বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

সব চেয়ে বেশী আশ্চর্য লাগে যখন মানুষ-খেকো হাঙরগুলোর ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে। আবার হাসতে হাসতেই অক্ষত দেহে উঠে আসে নৌকোয়। এ দৃশ্য দেখে প্রথমে অনেকেই ভেবেছে—এটা নিছক মায়াবিনীর মায়া বিস্তার। জলে হাঙরের ভয় দেখিয়ে মন দুর্বল করে দেয়। সম্মোহিত করে ফেলে সবাইকে। যেটা দেখা যায়—সেটা মনের ভুল চোখের ভুল ছাড়া অন্য কিছু নয়।

কিন্তু এ যুক্তি খাটল না শেষ অবধি। ডেভিড সাহেব ডাইনীর কারচুপি ধরার কম চেষ্টা করেছে নাকি। নাজেহাল হয়ে গেছে সাহেব। তীরে

খুঁটি পুঁতে তাতে ছাগলটার দড়ি শক্ত করে বেঁধে রেখে জলে নামিয়ে দিয়েছে। করুণ আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে দড়ি ধরে টেনে তুলেছে ছাগলটাকে। বিস্ফারিত চোখে দেখেছে সাহেব, শুধু সাহেব কেন অন্য দর্শকেরাও—ছাগলটার পিছনের দু'পা কেটে নিয়ে গেছে হাঙর ধারালো দাঁতে।

হো-হো করে হেসে উঠেছে মিলিণ্ডা। সাহেবের দিকে কটমট করে তাকিয়েছে। তবুও হাল ছাড়েনি সাহেব। একবার দু'বার, বারবার, এই ভাবে পরীক্ষা করে শেষে হার মেনেছে।

সাহেব হার মানল বটে, কিন্তু মিলিণ্ডার আক্রোশ বাড়ল সাহেবের ওপর দ্বিগুণ। ও যেন মুক্তো তোলা বন্ধ করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল।

সে আশা পূরণ হয়েছে মিলিণ্ডার। ওর দৌরাত্ম্যে মুক্তো তোলা বন্ধ আজ বছর দুয়েক ধরে। জব্দ হয়েছে সাহেব। অসম্ভব লোকসান হচ্ছে ব্যবসায়। ঠিকাদারদেরও সাহেবের অবস্থা। ডুবুরি মাঝিদের অন্ন জুটছে না পেটে। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে দিন গুজরান করা দায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু মিলিণ্ডার দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে পারছে না কেউ। ওকে দেখার আগে দূর থেকে অনেক বীরপুরুষ হম্বিতম্বি করেছে—তারা এসেই এক মুহূর্তে জব্দ করে দেবে মিলিণ্ডাকে। হাতের পেশী ফুলিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, সে ক্ষমতা রাখে তারা।

দম্ভ-দক্ষতা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তাদের মিলিণ্ডার চোখে চোখ পড়তে। এগুতে পারে নি, পা পাথর-ভারী। বাড়াতে পারে নি হাত—অবশ। খুলতে পারেনি মুখ—হতবাক। একেবারে নিষ্প্রাণ-নিষ্পন্দ হয়ে গিয়েছে তারা। মিলিণ্ডার ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা দুষ্কর। এ অলুক্ষুণে কাণ্ড দেখার কোন সাধ নেই আমার। এরকম কোন সাধ থাকাও উচিত নয়, নিজের মনকে বোঝাতে লাগলুম বার বার। কেন জানিনে বিপরীত ফল হল। অদম্য কৌতূহল জেগে উঠল মিলিণ্ডার এই ব্যাপার দেখার। তবুও বদ ইচ্ছেটাকে শেষবারের মতো মন থেকে সরাবার জন্য সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নেব ঠিক করলুম।

'গুডবাই' কথাটা জিভের ডগায় এসে আটকে গেল। সঙ্গ ছাড়তে চাইছি, মুখ দেখে আঁচ করতে পেরেছিল বোধহয় সাহেব। কিন্তু কেন সঙ্গ ছাড়তে চাইছি, সেটা যে বোঝেনি একদম জানা গেল তার কথায়।

সাহেবের মতে ভাগ্য সুপ্রসন্ন এবার। হাওয়া যেন অনুকূলে বইতে শুরু করেছে! মিলিণ্ডা মুক্তো তোলার দিনে এভাবে আসেনি কখনো। এসেছে হঠাৎ সমুদ্রের ধারে ঝড়ের বেগে। এসেছে ঠিক ডুবুরিদের জলে নামবার মুখে।

এসে আজ ফিরে গেছে। তাই মনে হচ্ছে সমুদ্রের দিকে যাবার সম্ভাবনা নেই আর ওর। সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নেই আমার। মুক্তো তোলা দেখতে এসেছি যখন—সুবর্ণ সুযোগও পাওয়া গেছে যখন, তখন দেখে ফেরাই ভালো, অনুরোধ করল আমায় সাহেব।

সাহেবের সঙ্গে সমুদ্রতীরে এসে হাজির হলুম আমি।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। সাহেব আঙুল দেখিয়ে ইঙ্গিত করল মাঝিদের নৌকো ছাড়তে। ডুবুরিদের দিকে চেয়ে হাসল। সাহেবের এ হাসির অর্থ বোঝে তারা। সমুদ্রে নামবার জন্য পাথর দড়ি ব্যাগ, সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে নৌকোর ওপর উঠে বসল ওরা।

কি যে হল বুঝতে পারলুম না। হঠাৎ যেন একটা আতঙ্ক নেমে এল সবার চোখে মুখে। পিছন ফিরে তাকাতেই চমকে উঠলুম। মিলিগুা। কি ভীষণ মূর্তি! সাক্ষাৎ দানবী যেন। কিছুক্ষণ আগে দেখা মিলিগুার সঙ্গে এ মিলিগুার কিছু মিল নেই।

তড়িৎগতিতে এগিয়ে এল মিলিগুা নৌকোর কাছে। উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে টমাস নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়ল তীরে। ছুটে পালাতে যাচ্ছে, ডাকল মিলিগুা। তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠ। দাঁড়িয়ে পড়ল টমাস। শক্তসমর্থ জোয়ানটার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল টমাস মন্ত্রমুগ্ধের মতো। উঠল নৌকোয়।

সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিলিগুা। ওর দু'চোখের আগুন ঠিকরে পড়ছে টমাসের চোখে।

হতভম্ব হয়ে দেখছি সবলে—নৌকোর চারপাশে হাঙর ছেয়ে যাচ্ছে। বাতাস ভারী হয়ে উঠছে মনে হচ্ছে। আচমকা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিলিগুা।

রুদ্ধনিশ্বাসে দেখছি আমরা। দেখলুম অক্ষত দেহে হাসতে হাসতে মিলিগুা নৌকোর ওপর উঠল আবার। একটাও হাঙর দেখা যাচ্ছে না জলে আর।

গম্ভীর গলায় মিলিগুা আদেশ করল টমাসকে—জলে নামো। ঝিনুক তুলে নিয়ে এসো। হাঙরের ভয় নেই। ডিনামাইট বন্দুকের শব্দে হাঙর তাড়াতে হয় নি। ওরা আপনা হতেই চলে গেছে।

ডান হাতে বড় ভারী পাথর বাঁধা দড়িটা ধরল টমাস। ডান পা পাথরটার ওপর রেখে নিশ্বাস টেনে নিল জোর করে। তারপর, পাশের দড়ির বাঁ দিকটায় ঝিনুক তোলবার থলে দুটো ঠিক বাঁধা আছে কিনা, চোখ বুলিয়ে নিল

একবার।

নামছে টমাস। নামছে নামছে নামছে। ওকে আর দেখতে পাচ্ছিনে আমরা। জলের অনেক তলায় চলে গেছে মনে হচ্ছে। যেখানে ঝিনুক সেই মাটিতে দাঁড়িয়েছে নিশ্চয়ই। হাতড়ে হাতড়ে ব্যাগ ভর্তি করছে ঝিনুক। দড়ি ধরে ইঙ্গিত করেছে সমুদ্রের অগভীর মাটির বুকে পা ফেলতেই। দড়ি নাড়িয়ে ওপরের লোকের হাতে টান দিয়ে এই বার্তা পৌছে দিয়েছে। তাই লোকটা পাথর বাঁধা দড়িটা গুটিয়ে নিয়েছে টেনে টেনে। পাথরটাকে তুলে রেখেছে নৌকোয়।

বাঁ হাতের রিস্টওয়াচটা দেখছে ডেভিড সাহেব। মিনিট গুণছে। এক দুই তিন · আট। অস্থির হয়ে পড়ল সাহেব। এমনি ডুবুরিরা জলের তলায় দম বন্ধ করে দু'মিনিটের বেশী থাকতে পারে না। জন পারত চার মিনিট। টমাস তার দেখাদেখি অভ্যেস করে করে, সাত মিনিট অবধি দম বন্ধ করে থাকতে পারত জলের তলায়।

আট মিনিট হয়ে গেল, অথচ নীচের লোকের কোন সঙ্কেত এসে পৌছল না ওপরের লোকের হাতের দড়িতে। মহা ভাবনায় পড়ল সাহেব। জন-টমাসের জলে থাকার নির্দিষ্ট মিনিটের কথা জানাল সাহেব আমায়। আবার রিস্টওয়াচের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মুখে উচ্চারণ করতে লাগল জোরে জোরে।—নয়—দশ—এগারো বারো।

আর গুণতে পারল না সাহেব। গুণতে চাইলও না। যথেষ্ট সময় অপেক্ষা করা গেছে। সাতের জায়গায় বারো মিনিট—পাঁচ মিনিট বেশী। একটা অশুভ আশঙ্কায় সাহেবের গলা কেঁপে উঠল। কাঁপা গলায় নির্দেশ করে দিল অন্য ডুবুরিদের জলে নেমে টমাসকে তুলতে। তাকাল মিলিণ্ডার দিকে। নৌকো থেকে ঝুঁকে নিবিষ্ট মনে মিলিণ্ডা যেন কি দেখতে চেষ্টা করছে। জলের গভীরে ওর প্রখর দৃষ্টি পৌছবার চেষ্টা করছে বুঝি। মনে হল, কি যেন দেখতে পেল ও। মুখ তুলতেই মালুম হল। মিলিণ্ডার ভয়ানক রূপটা নেই। সে উগ্রভাব আর দেখা যাচ্ছে না, কমনীয় ভাবটা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। হাসছে মিলিণ্ডা পরিতৃপ্তির হাসি। সাহেবের চোখে চোখ পড়তে নৌকো থেকে নেমে পড়ল। সাহেবেরই পাশে এসে দাঁড়াল চুপচাপ। তোলা হল টমাসকে। আমাদের সামনে এনে রাখল ডুবুরিরা টমাসের প্রাণহীন দেহটাকে। সাহেবের কানের কাছে মুখ এনে মিলিণ্ডা বলল, নন্দীনায়া···বিশ্বাস হল সাহেব তোমার এবার?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাথা মাটিতে নোয়াল ডেভিড সাহেব। মৃত্যুঘরে মিলিণ্ডার কথারই প্রতিধ্বনি বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে, নন্দীনায়া। বিশ্বাস হল।

অফিসে এসে বিশ্বাস অবিশ্বাস হওয়ার এক অভিনব কাহিনী শুনলুম সাহেবের কাছে। টমাসের মতো জনেরও মৃত্যু হয় জলের তলায়। টমাস আর জন, দুই বন্ধুতে হাসতে হাসতে নেমেছিল জলের তলায় ঝিনুক কুড়ুতে। মুক্তো পাবে। চার মিনিট হয়ে গেল তবুও উঠল না ওপরে জন। হাতে ধরেছে, পায়ে ধরেছে সাহেবের মিলিণ্ডা। কেঁদে বুক ভাসিয়ে অনুরোধ করেছে, কালবিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি তুলে ফেলতে জনকে।

কর্ণপাত করেনি সাহেব ওর কথায়। ভেবেছিল, জন হয়তো মিনিট বাড়ানোর অনুশীলন করছে তলায়। সাত মিনিটের মুখে টমাস উঠে এল একা। সাহেবের প্রশ্নের জবাবে জন সম্বন্ধে কিছু জানে না বলল। আর বলল, ক'দিন ধরে আমার চেয়ে মিনিট বাড়াবার কথা বলছিল জন। মিনিট বাড়লে ঝিনুক তুলতে পারবে বেশী। টাকা পাবে বেশী। তাই দমবন্ধ করে থাকার অভ্যেসটা বাড়াতে হবে। নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিলুম। ও কি করছে না করছে, লক্ষ্য রাখিনি অত।

টমাসের এই ধরণের জবাবদিহি মেনে নেয়নি মিলিণ্ডা। ওর অত কথার একবর্ণও বিশ্বাস করেনি। সাহেবের কাছে গোপন কথা গোপন করেনি সে। টমাস রোজ আসত মিলিণ্ডাদের খুবরিতে। ওকে একলা পেলেই রাণী বানাবার কথা শোনাত। জন দু'মিনিটের জায়গায় চার মিনিট দম বাড়িয়েছে। সে-ও ওর চেয়ে তিন-চার মিনিট বাড়াবে। তখন? তখন জনের চেয়ে তার উপায় হবে বেশী। আর মিলিণ্ডা তো জনকে ছেড়ে আসতে বাধ্য হবে তার কাছে রাণী হবার জন্য।

কথা শুনে পা থেকে মাথা অবধি জ্বলে উঠেছে মিলিণ্ডার। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে ওকে। দাঁত বার করে হাসতে হাসতে চলে গেছে টমাস। আবার এসেছে, আবার গেছে। জনের মৃত্যু হবার আগের দিনেও এসে জানিয়েছে এবার তাড়াতে পারবে না আর ওকে সে। নিজে হতেই ঘরে ডেকে তুলবে।

মিলিণ্ডার জন্যই টমাস উন্মত্তের মতো জনকে পৃথিবী থেকে যে সরাতে চেয়েছিল এটা অবিশ্বাস করেছিল সাহেব। অবিশ্বাস করেছিল, মিলিণ্ডার মুখে শোনা জন-হত্যার কাহিনীটাও। জনের দম বন্ধ রাখার সময় উতরে যাওয়ার

পরও ওকে জোর করে জলের তলায় আটকে রেখে মরতে বাধ্য করেছে টমাস। স-দৃশ্য স্বপ্নে দেখেছে মিলিণ্ডা, জনের কবরের ওপর মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল যখন হঠাৎ। জেগে উঠে আবার কান্নায় ভেঙে পড়েছে। সে কান্না থামতে চায়নি তার কিছুতেই। কাঁদতে কাঁদতেই শুনেছে, ভিতরে কে যেন কথা কয়ে উঠছে জোরে জোরে। সাহেব কোন প্রতিকার করতে না পারলে ব্যবসা নষ্ট হবে। জনের মতো টমাসকেও মরতে হবে একদিন নিশ্চয়ই। কেউ রক্ষে করতে পারবে না, পারবে না—পারবে না।

পাগলেরই প্রলাপ বটে। মিলিণ্ডা কিছু বলতে এলে শুনত না সাহেব। ওকে দূরে দেখলে পালাতে চেষ্টা করত। পাগলীর উপদ্রব থেকে বাঁচবার জন্য। কিন্তু বাঁচতে পারেনি সাহেব ওর কোপ থেকে। দিন দিন ভীষণ হয়ে উঠতে লাগল মিলিণ্ডা। এই ভীষণ ভাবটা মুক্তো তোলার সময়েই হত ওর। অন্য সময় স্বাভাবিক। স্বাভাবিক অবস্থাতেই ওর ডেরায় গেছে সাহেব ব্যবসায় ক্ষতি না করবার জন্য বোঝাতে। গেছে টমাসের ওপর ভুল ধারণা থেকে অনুরোধ করে নিবৃত্ত করতে। টমাসের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই। স্বপ্ন স্বপ্নই। সত্যি নয়। গোড়া থেকে টমাসকে অন্য চোখে দেখার ফলই এই দুঃস্বপ্ন!

ধীর-স্থির হয়ে শুনেছে মিলিণ্ডা সমস্ত। তারপর বলেছে, সাহেব! বিশ্বাস কর! আমি যে কি করি কিছুই জানি না নিজে।

টমাসের মৃত্যুর পরও দেখেছি মিলিণ্ডাকে সমুদ্রের ধারে। ঝিনুক তোলবার সময় এসে দাঁড়িয়েছে রোজ। কপনি পরা হৃষ্টপুষ্ট কালো মানুষগুলোকে জলে নামতে উৎসাহ দিয়েছে হাসি মুখে। জল থেকে রাশি রাশি ঝিনুক তুলে, ব্যাগ ভর্তি করে ওপরে এসে উঠেছে ডুবুরিরা নির্বিঘ্নে। দেখে, আনন্দে জ্বলজ্বল করে উঠেছে মিলিণ্ডার স্নেহস্নিগ্ধ দু'চোখ।

৪

সিঁড়ির ধাপে ধাপে পায়ের শব্দ—একসঙ্গে অনেক লোক উঠছে যেন। ভীতসন্ত্রস্ত চোখে খোলা দরজার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সুদর্শন। একটু আগে আচমকা ঘুম ভেঙে গেছে। চোখ খুলে ঘরের চতুর্দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেছে। রামভকত নেই। দক্ষিণদিকে চারপাইটা খালি। মানুষটা কখন দরজা খুলে নিঃসাড়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে সুদর্শন টের পায়নি একটুও। মরণ ঘুম ঘুমিয়েছিল যেন। উত্থানশক্তি রহিত সুদর্শন উঠতে চেষ্টা করছে। দু'হাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে ব্যর্থ চেষ্টা করল খানিক। চিৎকার করে যে কাউকে ডাকবে, সে উপায়ও নেই। মাস দুয়েক হল গলার স্বর উচ্চগ্রামে ওঠে না আর। কমতে কমতে এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, এখন তো পাশের লোকও একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে কথা বুঝতে পারে না তার। ফিসফিস করে নিঃশ্বাসের আওয়াজে কথা কয় সে। প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া অন্য কথা কয় না আর। কইতেও পারে না।

গলায় যতটা জোর দেওয়া যায়, ততটা জোর দিয়েই রামভকতকে ডাকল বারতিনেক। শুনল না কেউ, সাড়া দিল না কেউ। সুদর্শন নিজের কানেই শুনল স্রেফ। আর শুনল বোধহয় ঘরের বাঁ কোণের প্রদীপের শিখাটা। ওটা একটু জোরে কেঁপে উঠল বারতিনেক।

ঘরে ঢুকল পরপর ক'জন। কজন গোনবার সময় ছিল না তখন সুদর্শনের। দেখেছিল কতকগুলো কালো ছায়া ঘরময় ঘোরাফেরা করছে। ঘোরফেরা করছে তার চারপাশে। বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করছে। মৃত্যুর আগে নিজের মৃত্যু দেখছে। কালোছায়াগুলো তার চারপাইয়ের চতুর্দিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাত না তুলেও তাকে স্পর্শ না করেও যেন একসঙ্গে বহু হাতে তার আপাদমস্তক সজোরে চেপে ধরছে। হিম হয়ে আসছে সর্বশরীর। ক্ষীণ হয়ে আসছে নিঃশ্বাস। দম আটকে যাচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণা।

পিলসুজসুদ্ধু প্রদীপটা নিয়ে এস এদিকে। বজ্রগম্ভীর স্বরে আদেশ করল একজন অন্যজনকে। ঘরটা কেঁপে উঠল। প্রদীপের শিখাটা কাঁপছে থরথর করে।

ছায়ার কথায় কায়ার কণ্ঠস্বর শুনে বুকের ভারবোধ কমল অনেকখানি

সুদর্শনের। ঘরটারও ঘন বাতাস পাতলা হয়ে এল। যে ক'টা এসেছে, মানুষ ভিন্ন অন্য কেউ নয় তারা। ভূত-প্রেত অশরীরী নয় কেউ। কঙ্কালসার চেহারায় ভিতরে সাহস ফিরে পাচ্ছে সুদর্শন। মানুষকে ভয় করেনি জীবনে। ভয় করতে শেখেনিও কখনো। একা একটা লোকের মহড়া নিয়েছে এক সময় ভরাযৌবনে। সুদর্শনের লাঠির সামনে সাহস করে এগিয়ে আসতে পারেনি কেউ কোনদিন। দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি এক মুহূর্তও।

যৌবনের সুদর্শন লাঠিয়াল জেগে উঠছে যেন মৃত্যুপথের যাত্রী সুদর্শনের ভিতর। চোখ দুটো জ্বলে উঠছে দপ দপ করে। সাদা ফ্যাকাশে চোখে অত রক্তের লাল এসে গেল হঠাৎ কোত্থেকে কে জানে। সুদর্শন নিজেও জানে না। আগন্তুকদেরই একজন সামনে আনা প্রদীপটা পিলসুজ থেকে তুলে, মুখের কাছে আরতির মতো দু'চারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কি যেন দেখতে চেষ্টা করল। তারপর সরোষে বলে উঠল, রক্তচক্ষু দেখিয়ে কোন লাভ হবে না। যা করতে এসেছি, তা তোমাকে করাতে হবেই।

প্রদীপের আলোয় চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লোকগুলোর পা থেকে মাথা অবধি একবার করে দেখে নিল সুদর্শন। প্রত্যেকের সর্বাঙ্গ কালো আলখাল্লায় ঢাকা। মুখ কালো মুখোশে ঢাকা। এই মিশমিশে কালো আবরণ ভেদ করে শরীরের কোন অঙ্গ দেখবার উপায় নেই কারো। চেনা-অচেনা নিশানা জানবার উপায় নেই কারো।

হাতের প্রদীপ নামিয়ে রাখল লোকটা পিলসুজের ওপর। মুখ না ফিরিয়েই পাশের লোকের সামনে হাত বাড়াল। ও মানুষটা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ পাথর মূর্তির মতো। এবারে নড়ল একটু। বুকের কাছে, আলখাল্লার নীচে থেকে একখানা কাগজ বার করে হাতে দিল।

বুকের মধ্যে ঝড় বইছে সুদর্শনের। এ কি দেখছে! এ কি দেখল! কাগজ দেবার সময় যার হাত দেখল, যে আঙুল দেখল—অচেনা নয়, অজানা নয়। ফর্সা হাতটায় কালি মাখিয়েও চোখে ধোঁকা লাগাতে পারেনি সুদর্শনের। আংটিটা আঙুল থেকে খুলতে ভুলে গেছিল হয়তো ও। আংটিই চিনিয়ে দিয়েছে ভালো করে সুদর্শনকে—ও কে।

নামটা উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল মুখ দিয়ে—থমকে গেল। ওর সকলে মিলে উচ্চারণ করতে দিল না তাকে। চারদিক থেকে চোখ ধাঁধানো চকচকে ছোরা উঁচিয়ে ধরেছে। চোখের ওপর, মাথার ওপর বুকের ওপর।

সুদর্শন বিস্মিত ক্রুদ্ধ নির্বাক নিরুপায়।

কাগজটা হাতে পেতে সুদর্শনের দিকে এগিয়ে দিয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, শীগ্‌গির সই করে দাও। না দিলে, পরিণতিটা আঁচ করতে পারছ নিশ্চয়। জোর করে সুদর্শনের ডান হাতে কলম গুঁজে দিল লোকটা।

একবার সবার দিকে তাকিয়ে দেখল সুদর্শন। তারপর ব্যর্থ ক্ষোভ ঝড়ে পড়ল মৃদুনিঃশ্বাসে। দুর্বল হাতে পুরো নামটা সই করে দিল।

কার্যসিদ্ধি হয়ে গেছে। আর এক তিলও দাঁড়াবার প্রয়োজন নেই কারো এ ঘরে। ত্বরিৎগতিতে উধাও হয়ে গেল সকলে ঘর থেকে।

খানিক পরে আবার সিঁড়ির ধাপে ধাপে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সুদর্শন। যাবার সময় হয়তো ওকে শেষ করে যেতে ভুলে গেছে বলে ফিরে আসছে ওরা।

সুদর্শনের ভুল ধারণা ভাঙল আগন্তুকদের দেখে। যারা এসেছে, তারা রামভকতের লোক। এই রকম যে ঘটবে, এটা রামভকত বুঝতে পেরেছিল বাইরের লোকের কানাঘুষো থেকে। সকালেই বুঝেছিল। তার লোকদের বলাও ছিল এদের প্রতিরোধ করবার জন্য। উচিতমত শিক্ষা দিয়ে শায়েস্তা করবার জন্য। ওদের আসবার আগে রাতে উঠে নিজের লোকদের আনতে গেছিল তাই ও। আপসোসের অন্ত নেই তার। তারা পৌঁছবার আগেই কাজ সমাধা করে সরে পড়েছে ওরা।

রামভকতের কথা শুনে মুখে কিছু বলল না সুদর্শন। কিছুক্ষণ ধরে একদৃষ্টে দেখল শুধু ওকে। দেখল আর ভাবল। কি দেখেছে রামভকতকে এতদিন ধরে? কি ভেবেছে ওর সম্বন্ধে? জয়রাজের সমস্ত কথাই কি ফলবে শেষ পর্যন্ত? যুক্তিতর্কের তলোয়ার দিয়ে কেটে কুচি কুচি করে দিয়েছে জয়রাজের অনেক যুক্তিতর্ক। তবুও হার মানেনি জয়রাজ। হার মেনেছিল সে-ও কি তার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে? না, সেখানে সে অটুট অবিচল।

দৌড়ে কাছে এসে, সুদর্শনের বুকের ওপর বাচ্চা ছেলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল রামভকত। চাচা— ক্ষমা কর! দেরী হয়ে গেছে। এসে যে তোমায় প্রাণে বেঁচে থাকতে দেখেছি—এটাই পরম ভাগ্য আমার।

নির্বাক মুখে রামভকতের মাথায় হাত বুলোতে লাগল সুদর্শন শীর্ণ হাতে।

বুকের ওপর থেকে উঠে পড়ল রামভকত। সুরাই থেকে জল গড়িয়ে গেলাস ভর্তি করে নিয়ে এল—চাচা! এতক্ষণে বুকের ভিতর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে নিশ্চয়। ভিতরটা ভিজিয়ে নাও একটু একটু করে।

সুদর্শনের দু'চোখে ভয়। ঘাড় নাড়ল। খাবে না, ঠোঁট টিপে রইল জোর

করে। দিনে রাতে যে কোন সময় জল খাওয়াতে গেলে এই রকমই করে সে। ভিতরটা জ্বলে যায় তার হু হু করে।

সব জানে রামভকত। সব শুনেছে সুদর্শনের কাছ থেকে। তবুও রামভকত সব সময় ওকে জল খাওয়াবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যুক্তি দেখায়, ডাক্তাররা বলেছেন। জোর করে খেতে হবে। পেটের ভিতর বুকের ভিতর ঘায়ের জন্য কষ্ট একটু হবে। শীগ্‌গির ভালো হয়ে যাবে। এ কষ্ট থাকবে না তখন আর।

ঠোঁট ফাঁক করে, জোর করে জল ঢেলে দিল গলায় রামভকত। ফেলতে পারল না সুদর্শন। মুখে হাত চেপে ধরল রামভকত। ঢোঁক গিলল সুদর্শন অতি কষ্টে। মুখখানা যন্ত্রণাকাতর বিবর্ণ হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। দু'চোখের কোণ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল দু'গাল বেয়ে।

এই অবধি পড়ার পর আমার যেন কেমন মনে হতে লাগল। হঠাৎ টওসা নদ'র ঠাণ্ডা বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উঠল যেন। পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে ছুটে আসছে ঘরের ভিতর। আছড়ে আছড়ে পড়ছে আমার গায়ে। ভিতর বার জ্বলে যাচ্ছে আমার। দারুণ জ্বলুনি। খাতাটা চারপাইয়ের ওপর রেখে দিয়ে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালুম আমি। টওসা নদীর তীরে আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে। কার মৃতদেহ পুড়ছে কে জানে। চিতার আগুনটা আকাশ ছুঁতে চাইছে বুঝি।

সুদর্শনের ভিতরটা জ্বলতে জ্বলতে শেষে দেহটাও জ্বলে উঠেছিল একদিন নিয়তির টানে ওই চিতায়, ওই শ্মশানে। প্রাণহীন দেহটা জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গেছিল। পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হয়ে গেছিল চিরদিনের মতো মানুষটা।

সুদর্শনের চিতার আগুন পুরোমাত্রায় জ্বলে ওঠবার সময়, যে মর্মন্তুদ দৃশ্য বিভীষিকা দেখেছিলুম ভুলতে পারিনি। নতুন করে চোখের সামনে সেই সব ভেসে উঠছে আমার। দু'চোখে হাত চাপা দিলুম আমি। সরে এলুম চারপাইয়ের কাছে। বসলুম। তুলে নিলুম খাতাটা আবার হাতে।

সন্ধ্যা নামছে বাইরে। আলো-আঁধারি হয়ে আসছে ঘরের ভিতরটা। আলোর দিকটায় খাতা রেখে সুদর্শনের কাঁপা হাতের টেড়া-বাঁকা লেখাগুলো পড়তে চেষ্টা করছি আমি। কানে বাজছে মর্মভেদী করুণ আর্তনাদ একটা। তবু পড়ার দিকে মনটাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছি আমি। পাতা ওল্টাচ্ছি, লেখা পড়ছি।

এই সোঢরী গাঁওয়ের মানুষ নিরীহও যেমন ভয়ঙ্করও তেমন। অতি বড় মিত্র অতি বড় শত্রু হয়ে ওঠে নিমেষে এক ইঞ্চি জায়গার দখল নিয়ে। একজন আর

একজনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করে না একটু। জমিজমা রক্ষার তাগিদে, দুশমনদের মারাত্মক আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য, প্রত্যেক ঘরের ছেলেকে সুদক্ষ লাঠিয়াল হয়ে ওঠবার চেষ্টা করতে হয় বাচ্চা বয়েস থেকেই—তার সামর্থ্য থাকুক আর না থাকুক।

সুদর্শনের সামর্থ্য ছিল। সুদক্ষ লাঠিয়ালের মর্যাদার আসন লাভ করতে বেশী বেগ পেতে হয়নি তাকে। এর জন্য অনেকের ঈর্ষার পাত্র যে হয়নি সে তা নয়। হয়েছিল। মৌখিক হৃদ্যতা দেখালেও অন্তরে বিষের ছুরি নিয়ে ঘুরত বহু লোক। সুযোগ সুবিধে পেলেই ওর নিপাত হওয়ার মারণাস্ত্র প্রয়োগ করতে কালবিলম্ব করবে না তারা।

বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল সুদর্শন—পাশের বাড়ির জ্ঞাতি ভাই বিহুলাল ওই দলের প্রধান পাণ্ডা। সুদর্শন জানে বিহুলাল তার কাছে অতি নগণ্য। তার হাতের দুটো আঙুলের ডগায় বিহুলালের প্রাণবায়ু। তাই যতটুকু সম্ভব এড়িয়ে চলত বিহুলালকে। নিজের মনকে সব সময় বিশ্বাস করা অনুচিত। কখন কি কুমন্ত্রণা দিয়ে বসে কে জানে।

সুদর্শনের এড়িয়ে চলাটাকে মহা দুর্বলতা ভেবে নিয়েছিল বিহুলাল। সকল বিষয়ে হাঙ্গামা বাধাবার জন্য ভীষণ তৎপর হয়ে সুদর্শনের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াত ছায়ার মতো।

স্বতন্ত্র ছিল বিহুলালের সম্বন্ধী রামভকত। পিতৃ-মাতৃ হারা রামভকত ওই বাড়ির একটা ছেলে যেন। ছোটবেলা থেকে মানুষ ও ওখানে। বিহুলালের স্নেহপুষ্ট হয়েও ও যেন অন্য ধরণের। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। ও-বাড়ির চেয়ে এ-বাড়ি পছন্দ তার বেশী। বিহুলালের চেয়ে সুদর্শনকেই তার ভালো লাগে খুব। অনেকটা তার চাচার মতোই দেখতে বলে এই আকর্ষণ। চাচা পৃথিবীতে নেই আজ।

দাদা ডাকা উচিত হলেও সুদর্শনকে চাচা বলেই ডাকত রামভকত। জোয়ান রামভকত অনেক সময় অনেক কিছু এসে বলেছে বিহুলালের বিরুদ্ধে। বলেছে দেওয়ালীর দিনে তার জমি দখলের ষড়যন্ত্রের কথা। বলেছে ওই দিনেই নেশায় মাতোয়ারা করে বরাবরের মতো চাচার নিশ্বাস বন্ধ করে দেবার কথা। চাচাকে বাইরে বেরুতে বারণ করছে। হুঁশিয়ার হয়ে চলতে অনুরোধ করেছে পায়ে ধরে বারবার। দু'চোখ ছল ছল করে উঠেছে। মৃত চাচার কথা মনে পড়েছে তার।

দেওয়ালীর দিন সুদর্শনকে আগলে থেকেছে দিনরাত। একবারের জন্যও বাড়ির বাইরে পা বাড়াতে দেয় নি। আঁকা-বাঁকা টওসা নদীর পূব কিনারের

জায়গাটাকে কেন্দ্র করে দু'দলের মধ্যে লাঠালাঠি হয়ে গেছে। মাথা ফাটাফাটি হয়েছে। রক্তগঙ্গা বয়েছে। হেরেছে বিহুলালের দল। জিতেছে সুদর্শনরা। জিতলেও এ দলের দু'একজনের যে প্রাণহানি হয় নি, তা নয়। হয়েছে। রামভকত জানিয়েছে, চাচারই বিপদ হবার কথা ছিল। ভুল করেই ও-দু'জনের জীবন নিয়েছে ওরা। ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ। বাড়ি থেকে না বেরুনোয় চাচা রক্ষা পেয়েছে।

রামভকতকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে সুদর্শন। বড় ছেলে পরাশরের হাতে ওর হাতটা টেনে নিয়ে এসে মিলিয়ে দিয়েছে। বলেছে, আজ থেকে জানবে এও তোমার আর এক ভাই।

পরের দিন সকালে রামভকত বাড়ি ফিরতে বিহুলালের ক্রুদ্ধ গর্জন ভেসে এসেছে সুদর্শনের কানে। জানালার কাঠের রেলিং ধরে দেখেছে ও-বাড়ির ঘরের ভিতরের ব্যাপার। রামভকতকে দেওয়ালে চেপে ধরে গলা টিপে ধরেছে বিহুলাল। বাড়িসুদ্ধু সকলে এসে ছাড়াতে চেষ্টা করেছে। রাগে ফুঁসছে আর চিৎকার করে। বলছে, বিহুলাল—নিমকহারাম বিশ্বাসঘাতকদের স্থান হবে না এবাড়িতে একদণ্ডও!

রামভকতকে বার করে দিয়েছে বিহুলাল বাড়ি থেকে। সাদা বালির রাস্তায় বসে বসে হাপুস নয়নে কেঁদেছে রামভকত। এ বাড়িতে আসেনি! পরাশরকে পাঠিয়ে জোর করে সুদর্শন নিয়ে এসেছে ওকে। সেই থেকে রামভকত এ বাড়িতেই রয়েছে। বছর খানেকের ভিতর হর্তাকর্তা বিধাতা হয়ে উঠেছে সে। বিষয় দেখাশোনা থেকে কোন কাজই সে ছাড়া গতি নেই কারো। সুদর্শনের প্রাণের প্রাণ সে। পরাশরের বিশ্বাসী বন্ধু! সুদর্শনের ছোট ছেলে মনোহরের অভিভাবক।

সকলের কাছে ভালো রামভকত কিন্তু একজনের দু'চক্ষের বিষ কেবল। এ-বাড়িতে আসার শুরু থেকে কোন দিন সুনজরে দেখেনি ওকে সে। সুদর্শনের বাল্যবন্ধু বিশেষ অন্তরঙ্গ লোক জয়রাজ। জয়রাজ অনেক কিছু কানে কানে বলে কান ভারী করতে চেয়েছে সুদর্শনের। ফল ফলেনি। সুদর্শন বন্ধুর ওপর বিরক্ত হওয়া ছাড়া সন্তুষ্ট হতে পারেনি। বন্ধু কিন্তু তার পথ থেকে সরেনি একচুলও। রামভকত শত্রুপক্ষের লোক। শত্রু যখন মিত্র হয়ে ঘরে ঢোকে তখন শিয়রে মৃত্যু আসারই সামিল মনে করতে হবে। বিষয়-আশয় নিয়ে রেষারেষি দু'বাড়ির লোকের রক্ত-মজ্জায়। এটা পূর্বপুরুষ থেকেই চলে আসছে। রামভকতকে দিয়ে নানা অভিনয়ের জাল বিস্তার করে, অনেক কৃত্রিম ঘটনা ঘটিয়ে সুদর্শনের

মনের কোণে রামভকত সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাস আনিয়েছে বিহুলাল। বাইরের শত্রু ঘরে ঢুকেছে। প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ করবে বিহুলাল শীগ্‌গির রামভকতকে দিয়ে।

বন্ধুর সতর্কবাণী হেসে উড়িয়ে দিয়েছে সুদর্শন। সাবধান তো হয়ইনি, বরং বন্ধুর গোপন উপদেশ-পরামর্শ—সমস্ত বলে দিয়েছে রামভকতকে। পিঠে হাত চাপড়ে সস্নেহে বলেছে, তুমি কিছু মনে কর না। জয়রাজটা বদ্ধ পাগল। কাকে বিশ্বাস করতে হয়, কাকে অবিশ্বাস করতে হয় কিছু জানে না।

এরপর থেকে কালরোগ ধরল সুদর্শনের। পেটের ভিতর জ্বালা। ডাক্তার বৈদ্যরা রোগ ধরতে পারল না। রোগ সারাতে পারল না হাজারো চেষ্টা করেও। রোগের ব্যাপার নিয়েও জয়রাজ বলেছে, ওর যত্ন নিতে, ওর হাতে কিছু খেতে কতবার মানা করেছি। নিশ্চয় কিছু জিনিস খাইয়েছে ও তোমায়।

ঘৃণা এসেছে বন্ধুর ওপর। খুব নীচমনা জয়রাজ। যে লোকটা নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করে দিনরাত জেগে, প্রাণ দিয়ে, সেবা করছে, সুস্থ করে তোলবার চেষ্টা করছে, তার নামে এই দুর্নাম দিতে জিভে বাধল না জয়রাজের।

সুদর্শনের কিছু হলে ছেলেটা পথে বসবে। নিজের দুই ছেলের মতো ধর্মছেলে রামভকতকেও বিষয়ের সমান অংশ উইল করে দিয়েছে। উইলের সময়ও বিশ্বাসের ভিত টলেনি সুদর্শনের একবারের জন্য। টলল পরাশর খুন হয়ে যেতে, টওসা নদীর ধারে জমি দখলের ব্যাপার নিয়ে। দখলের সময় পরাশরকে জায়গাটায় যেতে বার বার প্ররোচনা দিয়েছে রামভকত। পরাশরের যাবার প্রায়োজন না থাকা সত্ত্বেও। এ সময়ও পরাশরকে পাঠাতে নিষেধ করেছিল জয়রাজ।

বড় ছেলে যাবার পর ছোটকেও তৈরি করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠল রামভকত। ভীতু হয়ে ঘরে বসে থাকার কোন মানে হয় না। মনোহরকে যেতেই হবে অন্য জমি দখল করতে। ভাইয়ের খুনের বদলে খুন নিতে হবে তাকে।

জয়রাজ সুদর্শনের হাত ধরে অনুনয় বিনয় করে বারণ করল মনোহরকে যেতে দিতে। মনোহর চলে গেলে বংশে বাতি দিতে থাকবে না আর কেউ। কথাটা দাগ কাটল সুদর্শনের মনে। ভিতরটা অব্যক্ত ব্যথায় টনটন করে উঠল। বড় ছেলে যাবার পর থেকে ও-বাড়ির জানালা দিয়ে ভেসে আসে বিহুলালের পৈশাচিক উল্লাসের অট্টহাসি। কি জল খাওয়ায় কে জানে রামভকত। অন্যের হাতে খেলে ভিতর জ্বলে না। ওর হাতে খেলেই ভীষণ জ্বলে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে।

সম্পূর্ণ রামভকতের কব্জায় চলে গেছে সুদর্শন। ও তার নিয়তি, ও তার

মৃত্যু। রেহাই নেই ওর হাত থেকে বেরুবার আর এ-জীবনে। তার শেষ হোক দুঃখু নেই। মনোহর বাঁচুক। বংশ রক্ষা পাক।

গোপনে জয়রাজের সঙ্গে মনোহরকে শহরে পাঠিয়ে দিয়েছে সুদর্শন। মনোহরকে বাড়ির ত্রিসীমানায় না দেখতে পেয়ে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠেছে রামভকতের দু'চোখে। মোহ কেটেছে তাই এ আগুন দেখতে পেয়েছে সুদর্শন। ভয়ে শিউরে উঠেছে। জয়রাজের পরামর্শ মতো আগের উইল ছিঁড়ে ফেলেছে টুকরো টুকরো করে। এসে পড়েছে ঘরে রামভকত। ঘরময় ছেঁড়া কাগজের টুকরো দেখে চমকে উঠেছে। কাগজ কুড়িয়ে ভালো করে দেখে বুঝতে পেরেছে, উইল ছিঁড়ে বিষয়ের অধিকার থেকে নাকচ করে দিয়েছে তাকে সুদর্শন। রামভকতের মুখখানা রাগে রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে।

এর পরের ঘটনা—সেই রাতেই লোকলস্কর নিয়ে এসে ভয় দেখিয়ে সুদর্শনকে সই করিয়ে নিয়েছে। ওর হাতের আংটিটা দেখে চিনেছিল সুদর্শন ওকে। সমস্ত বিষয়টা নিজের নামে রাখবে বলে যে সই করিয়ে নিয়েছে, এটা বেশ বুঝতে পেরেছিল সে।

নতুন উইলে লিখেছে, আগেকার যত উইল, জ্ঞানে-অজ্ঞানে যেখানে যা সই করেছে, সমস্ত বাতিল, সব সম্পত্তি মনোহরের।

পাতা ওল্টাচ্ছি আমি। খাতার খানতিনেক পাতা একেবারে সাদা। কালির আঁচড় পর্যন্ত পড়েনি। চতুর্থ পাতায় সুদর্শন লিখেছে আবার। খুব ছোট্ট লেখা। এইটাই শেষ লেখা তার।

মনোহর কোনদিন ফিরে এসে যদি রামভকতকে বেঁচে থাকতে দেখে, একটুও দেরী না করে তখুনি যেন শহরে মামার বাড়িতে চলে যায়।

খাতাটা সুদর্শনের বিশ্বস্ত বন্ধু জয়রাজ দিয়েছিল পড়তে।

বাপ মারা যাবার খবর পেয়ে আমার সঙ্গে গাঁওয়ে এসেছিল মনোহর।

.. তখন চিতা জ্বলছে। শুনলুম, সুদর্শন না কি দুটো হাত ধরে বিশেষ অনুরোধ করে বলে গেছে রামভকতকে, মারার পর ও ছাড়া অন্য কেউ যেন তার মুখাগ্নি না করে। করলে তারা আত্মা তৃপ্তি পাবে না।

আমি আর মনোহর শ্মশানে বসে আছি। কাঁদছে মনোহর। চিতা থেকে একটু দূরে রামভকতও বসে আছে। কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। নজর পড়ল মনোহরের দিকে। ভিজে গলায় রামভকত চিৎকার করে বলে উঠল, চাচাজী চল গ্যয়েরে মনোহর। উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে আসছে মনোহরের দিকে।

আচমকা কি ঘটে গেল, বুঝে উঠতে পারল না শ্মশানসুদ্ধু কেউ। চিতার

আগুনটা লাফিয়ে উঠে, সজোরে ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন রামভকতের ওপর। মুহূর্তে জ্বলে উঠল রামভকতের সর্বশরীর। বাঁচবার জন্য রামভকতের কি আকুলিবিকুলি! বুক ফাটানো কি করুণ আর্তনাদ! যে দিকেই ছুটে পালাতে যাচ্ছে—আগুনটা যেন সেদিকের পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে। টানছে চিতার দিকে। নিয়ে এল চিতার পাশে একেবারে। একজন দু'জন নয়, বহুজন স্বচক্ষে দেখলুম সে নির্মম দৃশ্য। নিমেষে একটা দমকা বাতাস এসে রামভকতকে সজোরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল জ্বলন্ত চিতার মাঝখানে। লাল গনগনে আগুনটা আকাশ ছোঁয়া হয়ে উঠল ঠিক সেই সময়।

৫

প্রাসাদপুরীর আনাচে কানাচে থেকে শুরু ক'রে রাস্তা অবধি লোকে লোকারণ্য। এত লোকের চোখের সামনে দিয়েই কাউকে ভ্রূক্ষেপ না করে চলে গেল চন্দ্রশেখর। আগন্তুক বৃদ্ধের ত্ু'চোখে যেন কি ছিল। বৃদ্ধের চোখে চোখ রেখেই খানিক দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ। চন্দ্রশেখরের চেহারাটা একেবারে নিস্পন্দ পাথরমূর্তির মতো দেখাচ্ছিল।

ওর চোখ থেকে চোখ ঘোরালেন বৃদ্ধ নিজেই। পিছু ফিরলেন। বিজয়ী বীরের মতো এগুতে লাগলেন সামনের দিকে। অন্ধের মতো অনুসরণ করে চলতে লাগল তাঁকে চন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখর যেন সম্মোহিত মানুষ। ওর সঙ্গে বোধ হয় আমরাও সম্মোহিত হয়ে গেছলুম সেই সময়টায়।

কোন বাধা দেবার ক্ষমতা ছিল না কারো। বৃদ্ধকে কিছু বলবার সাহস ছিল না কারো। নির্বাক সকলে। চন্দ্রশেখরের মা-বাবা পর্যন্ত। আগন্তুককে দেখা মাত্র তাঁরা কেমন হয়ে গেছলেন। ত্ু'জনেরই মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছল। রাজ্যের ত্রাস ঘিরে ধরেছিল তাঁদের চোখে।

আলোর মালায় সাজানো প্রাসাদকে যেন অন্ধকার দেখাচ্ছিল। হয়তো আমাদের মনের চোখে অন্ধকার নেমে এসেছিল বলেই। চন্দ্রশেখরের ব্যাপারটায় স্নায়ুগুলো শিথিল হয়ে পড়েছিল। সবল অবস্থায় ফিরে আসতে সময় লেগেছিল বেশ খানিকটা।

যখন আমাদের আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল, যখন আমরা সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠলুম, তখন চন্দ্রশেখর নাগালের বাইরে চলে গেছে একেবারে। আর তাছাড়া ওর বিষয় পরে যা শুনলুম—তাতে আমাদের পক্ষে ওকে ফিরিয়ে আনাও অসম্ভব হত। অন্তত বৃদ্ধের হাত থেকে ছিনিয়ে আনবার মতো কোন ন্যায্য যুক্তি নীতি খাড়া করতে পারতুম না আমরা তাঁর কাছে।

চন্দ্রশেখরের মা-বাবার কাছ থেকেই শুনেছিলুম আমি ওর জীবন রহস্যের কথা। মা-বাবা গোপন করেই রেখেছিলেন সে কাহিনী সবার কাছে। জ্ঞাতি স্বজনের কাছে তো বটেই, তাছাড়া ছেলের কাছেও।

তেহেড়ীগাড়োয়াল রাজ্যের রাজবংশের রক্ত বয়ে চলেছে চন্দ্রশেখরের

ধমনীশিরায়। চন্দ্রশেখরকে নির্ভীক শিকারী যোদ্ধা আর রাজনীতিজ্ঞ করে গড়ে তোলবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন মা-বাবা। কোন বিষয়ে কোন ত্রুটি রাখেন নি জ্ঞাতসারে। তবুও ছেলে মনোমত হয় নি তাঁদের। এর জন্য আপসোসের অন্ত ছিল না। একমাত্র ছেলের ভবিষ্যৎ ভেবে হতাশায় বুক ভেঙে যেত তাঁদের মাঝে মাঝে। তখন নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকত না আর।

ছেলের জীবনে ভাঙাচোরা খেলার মূলে একটি মাত্র লোকেরই ছায়া এসে পড়ত বার বার। সে ঐ বৃদ্ধের। কোন কিছু না পারার জন্য অনেক সময় ছেলের ওপর রাগ করতে গিয়েও পারেন নি মা-বাবা। দয়া এসেছে, মায়া এসেছে। ওর ছলছলে চোখের দিকে তাকিয়ে ওকে নির্দোষই মনে হয়েছে। বৃদ্ধ কি নির্দয়! ছেলেটার ওপর—তাদের ওপর নির্মম আঘাত হানতে এত চেষ্টা করছে কেন? ছেলেটাকে কি ভুলতে পারেনা? ভুলতে পারবে না কখনো?

ভুলতে যদি চেষ্টা করত—তাহলে এত আসত না। একবার নয় দু'বার নয়—বার বার এসেছে। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অবিশ্যি চন্দ্রশেখরকে বাঁচিয়েছে বার তিনেক। সেটা মহতের মতো কাজ করেছে। মেনে নিয়েছে মা-বাবা। তার জন্য চিরকৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতার বন্ধনে বেঁধেছে বলে মা-বাবার স্নেহভরা বুক থেকে সবে ধন নীলমণি—তাঁদের চোখের মণিকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করবে—এ কেমন কথা।

মনে মনে কত অনুরোধ জানিয়েছে মা-বাবা—তুমি তো সব বোঝো—আমাদের মনের কথা রাখো! ছেলেটাকে ভিক্ষে দাও শুধু! তার বিনিময়ে যা চাও—নাও!

বধির কখনো শোনে না। শুনল না ঐ বৃদ্ধও। অনুরোধে দুর্বলতা বুঝল। বিরোধ বাধাল আরো এসে এসে। তখন থেকেই অজানা আশঙ্কায় দুরু দুরু কেঁপে উঠেছিল মা-বাবার বুক। একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। বৃদ্ধের প্রভাব থেকে ছেলেকে মুক্ত করবার জন্য অন্যমনস্ক করতে চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে মন টানতে চেষ্টা করেছেন।

বৃদ্ধকে দেখার কথা শুনেছে যখুনি, তখুনি আগুন জ্বলে উঠেছে মাথায়। বৃদ্ধকে কাছে পেলে—তার দেহটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে—ভস্ম নিয়ে নরেন্দ্রনগরের পাহাড়ী ঝরণার জলে ভাসিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে হবে। আপনাদের শান্তি হবে চিরকালের জন্য। ছেলেকে ধমকের সুরে বলেছেন—ওসব বাজে চিন্তা তোমার সাজে না। যাকে তুমি দ্যাখো—সে তোমার কল্পনার মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়।

মা-বাবার কথা শুনে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে যেত চন্দ্রশেখর। অল্প সময়ের জন্য হলেও, যাকে চাক্ষুষ দেখেছে, যার উপস্থিতি অনুভব করেছে স্পষ্ট, মৃত্যুগহ্বর থেকে টেনে বার করেছে যে এক একবার—সে কল্পনার মানুষ? চন্দ্রশেখরের মন সায় দিত না একটুও এ কথায়। একথা মেনে নিতে পারবে না কিছুতেই সে। কিছুতেই না।

ছেলের মুখচোখের ভাবগতিক দেখে বুঝতে আর বাকী থাকত না—মা-বাবার কথা একটুও দাগ কাটে নি। ছেলের মনে।

প্রমাদ গণলেন বাবা-মা।

চন্দ্রশেখরকে নিয়ে কোথায় যাবেন তাঁরা? লুকিয়ে রাখবেন এই ছেলেকে কোনখানে? ভেবে কুলকিনারা পেলেন না কোন। আগেকার কথা মনে পড়তে আরো নিরাশ হয়ে পড়লেন। অন্ধকার দেখলেন চতুর্দিকে। একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। একটুও ফাঁক নেই কোথাও। আলোর রেখা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না কোন দিক থেকেই। নিরুপায় তাঁরা।

তাঁদের নিরুপায় অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বেনারস পালিয়ে যাবার সময় বেশী করে। বৃদ্ধের যে দু'চোখ সদাসর্বদা পাহারা দিয়ে রেখেছে—ঘিরে রেখেছে ছেলেকে—তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।

নিশুতি রাতে চলন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখেছে ছেলেকে ঐ বৃদ্ধ। জানালা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ওর হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য। নিস্তার পাওয়া যায়নি। কোথা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছিল সকলের অজ্ঞাতসারে কে জানে। সবার চোখের সামনে ছেলের কাছে উপস্থিত হয়েই, কাউকে পলক ফেলবার অবসর না দিয়েই, আত্মগোপন করেছিল আবার আশ্চর্যভাবে। বৃদ্ধ যাদু জানে নিশ্চয়। তার যাদুর মায়া দেখিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল সবাইকে—বন্ধ জানলা দরজা আটকাতে পারে না তাকে। তার দৃষ্টির আওতা থেকে পালিয়ে যাবে কে কোথায়। অবারিত যাতায়াত তার সর্বত্র!

নিজের অগোচরেই ছেলেটাকে খুব ভালোবেসে ফেলেছিল হয়তো বৃদ্ধ। এতটা ভালোবাসা উচিত হয়নি তার পক্ষে। অন্যের ছেলেকে তার মা-বাবার চেয়ে বেশী ভালোবাসাটা নাকি ডাইনীর ভালোবাসা। কথাগুলো মনে পড়লে ভয় ধরত!

ভালোবাসার নমুনা দেখাতে গিয়ে দারুণ ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল একদিন বৃদ্ধ। বেনারসে পালিয়ে আসবার কিছুদিন পরেই ঘটনাটা ঘটেছিল। সেদিন অকারণ একটা জিদ পেয়ে বসল হঠাৎ চন্দ্রশেখরকে। ওর অবুঝপনা বেড়ে উঠতেই

লাগল। বেড়াতে যাবে গঙ্গার ধারে। কারো কথা শুনবে না।

বোঝানো হল—বয়েস বাড়ছে বই কমছে না তো আর। পাঁচ-ছ' বছরের ছেলের বায়না পনের-ষোল বছরে সাজে নাকি?

সাজে। বড়মানুষের মতো গম্ভীর গলায় উত্তর দিল চন্দ্রশেখর। আরো জানাল, বৃদ্ধ এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে গঙ্গার ধারে। হাত নেড়ে ডাকছে তাকে। সে নাকি বাড়ী থেকে বসে বসেই দেখছে সব!

শুনে, মা বাবা স্তম্ভিত, হতবাক।

হাড় জিরজিরে চেহারার বৃদ্ধের ক্ষমতার কথা অজানা নয় তাদের কাছে। ট্রেনের ব্যাপারটা ভোলবার নয়। স্বপ্নের মতো হলেও কখনো মন থেকে মুছে যাবার মতো নয়। বুড়োর ডাকে বাধা দিলে রেগে গিয়ে শেষে অনর্থ না কিছু করে বসে।

বুড়োর ডাক মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হল বাবা-মার।

গঙ্গার কাছাকাছি এসে থামল টাঙা। টাঙা থেকে নামলেন মা-বাবা। নামল চন্দ্রশেখর। বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে ডানদিকে। তার পায়ের তলা দিয়ে গঙ্গা বইছে। শীতের ক্ষীণকায়া গঙ্গা বিশাল রূপে ধরেছে! ফুলে ফুলে উঠছে। অত নীচে থেকে রাস্তা অবধি উঠে এসেছে। সিঁড়ির মন্দিরগুলো জলের তলায় ডুবেছে। ওপারের বালির চরের চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। কেবল জল আর জল। অথৈ জল। কি দুর্বার স্রোত। সর্বশক্তিই নিমেষে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে গঙ্গার এই ভয়ঙ্করী প্রকৃতি।

ভয়ঙ্করেরও একটা সৌন্দর্য আছে। একটা প্রবল আকর্ষণ আছে। এসেছে অনেক মানুষ। দূরে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে গঙ্গার এই রূপ। ভীত সন্ত্রস্ত চিত্তে দেখছে সকলে। খানিক পা বাড়ালেই অনিবার্য মৃত্যু। মুহূর্তে কোন অতলে তলিয়ে যাবে—খুঁজে পাবে না কেউ কখনো আর। তবু তারা দেখতে এসেছে।

দেখছেন চন্দ্রশেখরের মা-বাবাও। ছেলের দু'হাত ধরে দুপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। খেয়ালী ছেলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বুড়োর কাছে যাবার জন্য জলের ওপর দিয়েই দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করে দেয় শেষে।

যা ভয় করেছিলেন, তাই হল।

আচমকা ঝটকায় দুজনের হাত থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ল চন্দ্রশেখর। হাতের ইশারায় ডাকছে বৃদ্ধ। আছড়ে পড়ল চন্দ্রশেখর জলের ওপর। চতুর্দিক থেকে গেল গেল আর্তনাদ উঠল সমবেত কণ্ঠের। মুহূর্তে কি যে ঘটে গেল—কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না বাবা-মা। ছেলেটা যেন হারিয়ে গেল

জলের তলায়। জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন ওঁরা দুজনেই, বৃদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাত ধরে টেনে তুলল চন্দ্রশেখরকে। মায়ের কাছে নিয়ে এলো।

হারানিধি নয়নের মণি ছেলেকে ফিরে পেয়ে বুকে টেনে নিলেন মা। হাপুস নয়নে কেঁদে বুক ভাসালেন নিজের। তখন বৃদ্ধকে মনে হয়ে ছিল অতি আপন জন। এরকম হিতাকাঙ্খী বুঝি দ্বিতীয়টি আর কেউ নেউ তাদের। বৃদ্ধকে কৃতজ্ঞতা জানাতে মুখ তুলে তাকালেন। জলভরা চোখের ঝাপসা ভবটা কেটে যেতে পরিষ্কার দেখলেন, বৃদ্ধ নেই। আত্মগোপন করেছে তার স্বভাব অনুযায়ী! এক এক সময় বৃদ্ধকে পরম মিত্র মনে হলেও, শত্রু মনে হতেও খুব বেশী সময় দেরী লাগত না তাদের। বৃদ্ধ যেন বাহাদুরী নেবার জন্য দুর্বল মনের ছেলেটাকে বিপদের মাঝে টেনে নিয়ে গিয়ে তুলে আনে আবার। এ যেন ঠেলে দিয়ে টেনে ধরা গোছের। অবিশ্যি বৃদ্ধের ওপর এ ধারণাটা এসে গেছল এর পরের অন্য ঘটনা দেখে।

মিথ্যে এদেশ-ওদেশ পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো! বৃদ্ধের কাছ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে রাখা যাবে না নিজেদের। লুকিয়ে রাখা যাবে না ছেলেকে।

দেশে—তেহেরী গাড়োয়ালে ফিরে এলেন আবার মা-বাবা চন্দ্রশেখরকে নিয়ে।

এরপর বছর ঘুরেছে। শিবচতুর্দ্দশী। শিবমন্দিরে যাচ্ছেন মা-বাবা। চন্দ্রশেখরকে সংগে নিয়েই চলেছেন। পূর্বপুরুষদের শিবমন্দিরে শিবপূজো দেখবে। পাহাড়ী রাস্তায় এঁকে বেঁকে, উঁচুনীচু পথ মাড়িয়ে চলেছে ওদের গাড়ী। ঝুরিনামা বটগাছের তলায় শিবমন্দিরটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। খানিক গেলেই পৌঁছে যাওয়া যাবে। একটা বাঁকের মুখ ঘুরতে গিয়ে কারটা দুলে উঠল। একটু লাফিয়েও উঠল।

চন্দ্রশেখরের দিকের দরজাটা হয়তো ঠিক মতো বন্ধ করা হয় নি আগে থেকেই, গাড়ীটা প্রবল ঝাঁকুনি খাওয়ায় খুলে গেছে—নয়তো এমনিও খুলে যেতে পারে—কেন খুলল তার হদিস কিছু পাওয়া যায় নি। আচমকা দরজাটা খুলে যেতেই কার থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ল বাইরে চন্দ্রশেখর। ঠিক সেই মুহূর্তেই বৃদ্ধ বাইরে থেকে সজোরে ঠেলে দিল গাড়ীর ভিতর চন্দ্রশেখরকে। অবাক চোখে দেখল চন্দ্রশেখর বৃদ্ধকে। দেখলেন তার মা-বাবাও। এখানে এসময়েও এই লোক। চন্দ্রশেখরের চিন্তা ছাড়া ওর আর অন্য কোনোও চিন্তা নেই কি! এভাবে ভগবানের চিন্তা করলে, তাঁর ওপর দিনরাত নজর রাখলে— সত্যিই মানুষটা ভগবান পেয়ে যেত বোধ হয় এত দিনে। মতিচ্ছন্ন। মানুষের

চিন্তা! অন্যের ছেলের চিন্তা! পরের জন্য মাথা ব্যথায় অস্থির মানুষটা। বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠেছিল স্বামী-স্ত্রীর ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে।

সে রাতে ঘরে ফেরার সময় সেই বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন আবার বৃদ্ধকে ওঁরা। নিজেদের মনেরই প্রতিচ্ছবি দেখলেন কিনা বৃদ্ধের মুখে চোখে—বুঝে উঠতে পারেন নি। বৃদ্ধের সমস্ত মুখখানায় বিদ্রূপের হাসির প্রলেপ পড়েছে।

মা-বাবার বুকের রক্ত জল হয়ে গেছে ভয়ে। বুড়োর অসাধ্য কিছু নেই। প্রত্যেক বারে মরণ ফাঁদ থেকে চন্দ্রশেখরকে উদ্ধার করছে যেমন, তেমনি একদিন মরণ ফাঁদে ফেলেই কেড়ে নিতে পারে ছেলেটাকে ওঁদের কাছ থেকে। সব কিছু পারে বুড়ো। বুড়ো অচেনা নয়। অজানা নয়। কিন্তু ছেলের কাছে বুড়োর বিষয় গোপন করা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই ওঁদের।

বারে বারে মিথ্যে বলতে হয়েছে ছেলের কাছে। বৃদ্ধকে চেনেন না ওরা। ওরকম চেহারার কোনো লোকের সংগে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি কখনো। ওটা কোনো দুষ্ট প্রেতাত্মা। ওরা মায়াবী। মানুষকে আকর্ষণ করে। তারা সুখের ঘরে ভাঙন ধরায়। রক্ষার ভান ক'রে মেরে ফেলে মানুষকে।

স্বামী স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটায়। পিতাপুত্রে পৃথক করায়। অপরের সুখে গাত্রদাহ ওদের। চিন্তা করা উচিত নয় কারো। চিন্তায় ওরা কাছে এসে হাজির হয় বেশী করে। প্রশ্রয় পায়। ওদের ডাকে কাছে যাওয়া উচিত নয়।

চন্দ্রশেখরের ভয়ের কারণ কিছু নেই। শিবের বরপুত্র সে। যে-সে শিবের নয় আবার। একেবারে দাক্ষিণাত্যের সেরা—সব চেয়ে বড় শিব—তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর লিগংদেবের দোর ধরা সন্তান! বুড়ো প্রেত চন্দ্রশেখরকে বিপদে ফেলতে চেষ্টা করছে বারবার। বৃহদীশ্বরই বুড়োর ঘাড় ধরে, জোর করে বিপদ মুক্ত করিয়ে নিচ্ছেন। ভূতনাথ হাতে থাকলে ভূতের তোয়াক্কা করে কে! আর করা উচিতও না কারো।

কথাগুলো ছেলেকে বোঝাবার পর শেল বিঁধতে থাকে যেন বুকে মা-বাবার। হৃৎপিণ্ড ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যেতে থাকে দু'জনার। তাদের মতো এত বড় মিথ্যুক বোধ হয় দুনিয়ায় তৃতীয়টি নেই আর। নিজের স্বার্থের খাতিরে ছেলের কাছে এত বড় ধাপ্পা দিতে পারে না নিশ্চয় তাদের মতো আর কোনো মা-বাপ। অনুশোচনার আগুন জ্বলতে থাকে স্বামী স্ত্রীর বুকে মাথায়। জ্বলে দিনেরাতে। প্রতিটি ক্ষণে ক্ষণে।

কেউ জানুক না জানুক—তারা জানে বৃদ্ধ কে—বৃদ্ধ কি।

ছোট বেলা থেকেই চন্দ্রশেখরকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় দুশ্চিন্তায় আকাশ ভেঙে পড়ত মা বাবার মাথার ওপর।

তখন বছর আষ্টেক বয়েস চন্দ্রশেখরের। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে নামলেই কেমন একটা আচ্ছন্ন আচ্ছন্ন ভাব আসত যেন। তন্দ্রা নয়, ঘুম নয়। এ অবস্থাটা ওদুটোর একটাতেও পড়ে না। অথচ একটা বিশেষ ধরণের অবস্থা। ঠিক বলে বোঝানো যায় না। ওর শরীরটা থাকত এখানে মন চলে যেত অন্য রাজ্যে। সে সময়টায় বাড়ীর কথা কিছু কানে যেত না। কিছু মনে থাকত না। অন্য রাজ্যের কথা মনে থাকত ওর। অন্য রাজ্য বলতে পৃথিবী ছাড়া নয়। বাড়ী ছাড়া অন্য কোনোখানে।

সে জায়গার সমস্ত নিখুঁত বর্ণনা দিত চন্দ্রশেখর। গাছপালা ঘরবাড়ী নদী পাহাড়—সবেরই কথা বলত বড় মানুষের মতো বেশ বুঝিয়ে বুঝিয়ে। যেন স্বচক্ষে ও সব দেখে এসেছে। খানিক থেকে এসেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য হ'য়ে যেত বেশী মা বাবা--যখন আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যাবার পর বলে উঠত—মা! কি সুন্দর ফুলের গন্ধ! কি সুন্দর ধূপের গন্ধ। পাচ্ছ? পাচ্ছ না?

ছেলের এধরণের কথা শুনে, বিস্ময় বিমূঢ় হ'য়ে যেতেন মা। কি বলবেন, কি উত্তর দেবেন! কোনো কিছুরই গন্ধসন্ধ পাচ্ছেন না তিনি। নির্বাক মুখে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে দেখতেন শুধু ছেলেকে। দেখতেন ওর ভিতর এবং বার। ছেলের কিন্তু মায়ের দেখাদেখির ওপর লক্ষ্য থাকত না কোন। নিজের মনেই বলে যেত চারদিকে ফুল আর ফুল। রঙ বেরঙের ফুলের ছড়াছড়ি। উঁচু একটা মাটির বেদির ওপর সাদা ফুলের আসন পাতা। মাটির বেদিটা আর সিঁড়িগুলো গেঁড়ি মাটির রঙে রাঙানো।

আমি যেতে কত লোক এসে ঘিরে ধরল আমায়। বয়সী লোকেরা ধরে ধরে বেদীতে ওঠাল। বসিয়ে দিয়ে পুষ্প বৃষ্টি করতে লাগল মাথার ওপর। রাশি রাশি ফুলের মালা এসে পড়তে লাগল আমার গলায়। ফুলে ফুলে ডুবে যেতে লাগলুন আমি। ধূপ জ্বলছে আমার সামনে। অনেক ধূপ। খুব ভালো লাগছিল। সুগন্ধে ঘুম আসছিল। ঘুমিয়ে পড়ছিলুম আমি ফুলের ওপর—ফুলের স্তূপে মাথা রেখে।

ছেলের এ স্বর্গীয় আনন্দে আনন্দ পেতেন না মা। এ আনন্দে অশুভের কালো ছায়া দেখতেন যেন। অজানা ত্রাস ঘিরে ধরত তাঁকে। কথা শুনতে শুনতে সর্ব শরীর কেঁপে উঠত। শোনা যায় শিব সন্ন্যাসীর দেবতা। শিব নিজেও সন্ন্যাসী তবে কি···না, না। তাঁর ধারণা যেন মিথ্যে হয়। মিথ্যে হয়।

তাঞ্জোরে বৃহদীশ্বর লিংগদেবের একপাশে স্ত্রী পার্বতী আর এক-পাশে পুত্র সুব্রহ্মনিয়ামের—কার্তিকের মন্দির! শিব স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তো ঘর করছেন। তাঁর আশীর্বাদ নিশ্চয় রয়েছে চন্দ্রশেখরের ওপর। হতেই পারে না চন্দ্রশেখর সন্ন্যাসী হয়ে যাবে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে। হতে পারে না চন্দ্রশেখরের কল্পনার রাজ্যে ভেসে বেড়ানোটাই ওর ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস।

চন্দ্রশেখরের বয়েস বাড়ার সংগে সংগে আট বছরের ছেলের মুখের কথা ক'টাকে যুক্তিতর্কের কাঁচিতে মনের পাতা থেকে কেটেছেঁটে বাদ দিতে চেষ্টা করেছেন অনেকবার মা। কিন্তু পারেন নি। ভিতরে এমন একটা দুর্বলতা চেপে বসেছিল তাঁর—তাকে নড়ানোসরানো খুব শক্তব্যাপার। তাই বিশে পড়তেই চন্দ্রশেখরের বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন খুব তিনি।

ছেলে অমত করেছিল প্রথমে বিয়ে করতে। বাপও ছেলের পক্ষই নিয়েছিলেন। আর কিছু দিন যাক না। দেরী হলে ক্ষতি কি? করবো না যে বলছে—তা তো নয়। করবে। আর দিন কতক বাদে।

মায়ের মুখ থেকে সমস্ত রক্ত যেন সরে গেছল। ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। ভেবেছিলেন বাপ-ছেলের অমতটা না কাল হয়ে দাঁড়ায় শেষে! অমতটাই না স্থায়ী হয়ে পড়ে ছেলের জীবনে! উনি সব বুঝে সুজেও অবুঝের মতো কেন যে বেঁফাস কথা কয়ে, নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরে বসেন—তা জানেন না তিনি। একে তো বিয়ের নামে মনসা হয়েই আছে ছেলে। তার ওপর কর্তা আবার ওর পক্ষ নিয়ে ধুনোর গন্ধ ছড়ালেন।

অনেক বলেকয়ে কেঁদেকেটে তবে বিয়ে করতে রাজী করিয়েছিলেন ছেলেকে। যে রকম দিনের পর দিন বুকেব যন্ত্রণাটা বাড়ছে—তাতে কখন কি হয় কে বলতে পারে। বৌ দেখে যাবার সাধটা অপূর্ণ না থেকে যায় শেষ অবধি। মায়ের চোখের কোণ চিকচিক করে উঠতে হাত দুটো ধরে বলেছিল চন্দ্রশেখর—ব্যবস্থা কর। বিয়ে করবো আমি

মায়ের চোখের জল টস টস করে ঝরে পড়েছিল চন্দ্রশেখরের হাতের ওপর। মা-কে হাসাবার জন্য বলেছিল, তোমার মনের মতো মন হওয়া চাই কিন্তু বৌয়ের। বিয়ের মতটাকে বাবার কাছ থেকেও পাকাপাকি করে নেবার জন্য চেষ্টা করলেন মা। বাবাকে অনুরোধ করলেন—শেখরের জন্য আমার মনের মতো মেয়ে খুঁজতে গেলে এমনিতেই দেরী হয়ে হয়ে যাবে যখন, তখন দেরীতে বিয়ে হবার কথা এখন না তোলাই ভালো।

এরপর। মা পাত্রীপর্ব নিয়ে মেনে থাকতে লাগলেন। তাঁর মনের নিরিখে

মেয়েদের যাচাই-বাছাই চলতে লাগল। ছেলে না দেখতে চাইলেও মনোনীতাদের ছেলের কাছে পছন্দের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। গররাজী থেকেও মায়ের নির্দেশ অমান্য করতে পারত না চন্দ্রশেখর। মেয়েদের মনে-চোখে মায়ের স্নেহমাখা চোখ আর ব্যথা বোঝা মন খুঁজে খুঁজে দিশেহারা হয়ে পড়তে লাগল। ব্যর্থতার ক্লান্তি পেয়ে বসতে লাগল ওকে।

মেয়ে দেখাদেখির ব্যাপারে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতেও পড়তে হত এক এক সময়ে। যখুনি কোন মেয়েকে পছন্দ হবার উপক্রম হয়েছে চন্দ্রশেখরের—তখুনি বৃদ্ধ এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। মা শুনেছেন ছেলের মুখে। মনের সংশয় ঘোচাতে আড়াল থেকে লক্ষ্য রেখেছেন। মিথ্যে বলে নি শেখর। একটা বুকভাঙা নিশ্বাস ফেলে স্বগতোক্তি করেছেন মা—অলক্ষুণে বুড়োটা শুভকাজেও বাধা দিতে আসে নিশ্চয়। মরণ কি নেই ওর!

বুড়োর উপদ্রব থেকে নিশ্চিন্ত হতে হলে, খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়া দরকার চন্দ্রশেখরের। মনস্থির করলেন মা—ছেলেকে দিয়ে আর কোন পাত্রী পছন্দ করানোর দরকার নেই। ছেলে তো তার মনের কথা বলেই দিয়েছে। মনোমত ব্যবস্থা মা নিজেই করবে এখন।

দূর সম্পর্কের জ্ঞাতির একমাত্র মেয়ে।

—ষোড়শী সুন্দরী তন্বী বেদবতীর সংগে চন্দ্রশেখরের বিয়ের পাকাপাকি ব্যবস্থা করে ফেললেন মা।

বিয়ের দিন।

নতুন রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে প্রাসাদ পুরী আবার। আসছে আপনজন বন্ধুবান্ধব। আসছে জানাশোনারা। আসছে অনাহুতেরাও। বসন্তরাগ বেজে উঠছে নহবতের বাজনায়। হাসিখুশিতে মশগুল হয়ে উঠেছে মেয়ে মহল ছেলেদের বারবাড়া। আঙিনায় আনন্দের ঢেউ বয়ে চলেছে পরস্পরের প্রীতি বিনিময়ের মধ্যে। ভিতরের আনন্দের ঢেউ গেটের বাইরে দর্শকদের অন্তর ছুঁয়ে ছুঁয়ে দুলে উঠছে।

সূর্য ডুবু ডুবু হয়েছে। লালচে আভা দেখা দিছে আকাশে। পণ্ডিত জানালেন বাবার কানে কানে—সকলকে শুভযাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে এবার। কনের বাড়ী যাবার যাত্রালগ্নের সময় হয়ে আসছে। বাবার পাশে দাঁড়িয়ে আছে চন্দ্রশেখর। সুঠাম অঙ্গের সুপুরুষ চন্দশেখরকে বিয়ের পোষাকে মানিয়েছে ভালো। ওর হাসি হাসি মুখখানা বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। বন্ধুদের সঙ্গে

কথা কইতে কইতে গোলাপী সিল্কের রুমালটায় মুখ মুছছে থেকে থেকে।

আশপাশের সমবেতরা শুভযাত্রার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি বৃহদীশ্বর লিংগদেবের আশীর্বাদী ফুল নিয়ে আসতে ভিতরে দৌড়লেন মা। ছেলের সংগে দেবেন।

একুশ বছর আগে তাঞ্জোর থেকে এনেছিলেন খুব যত্ন করে। সোনার কৌটোয় পুরে ঠাকুর ঘরে রেখে দিয়েছিলেন। কৌটোটাকে নিত্য সকাল সন্ধ্যায় পূজো করতেন বৃহদীশ্বর লিংগদেবতার উদ্দেশে। তাঞ্জোরে এসে মায়ের অনেক দিনের সাধ মিটেছিল। মনের কথা শুনেছিলেন তাঁর বৃহদীশ্বর।

কৌটোটায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন মা। ছেলেকে দেবেন বলে রুপোর সিংহাসন থেকে তুলে নিলেন। দেখছেন কৌটোটার দিকে মা। চোখের সামনে ভেসে উঠেছে বৃহদীশ্বরের আড়াইশো ফিট উঁচু পাথরের মন্দিরটা। মন্দিরের ভিতরের গ্রেনাইট পাথরের বারোফুট উঁচু বৃহদীশ্বর—শিবলিংগ।

একতারার সুর ভেসে আসছে কানে। একটি ভিখিরী মেয়ে নাট মন্দিরের সিঁড়িতে পা ঝুলিয়ে বসে, সুমিষ্ট সুরেলা কণ্ঠে চোখ বুজে গাইছে—'গলে ভুজংগ ভস্মলিংগ শঙ্কর অনুরাগে'—

গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তন্ময় হয়ে শুনলেন মা-বাবা। পাণ্ডা কাছে এসে মন্দিরের ইতিহাস শোনালেন।—বিখ্যাত চোল রাজাদের অক্ষয়কীর্তি এটা। এক হাজার তেইশ খৃষ্টাব্দ থেকে এক হাজার চৌষট্টি খৃষ্টাব্দ—এই দীর্ঘ এক চল্লিশ বছর ধরে মন্দির তৈরী করিয়েছেন রাজা রাজেন্দ্র চোল, রাজেন্দ্র চোল ভারতগৌরব। তিনি ব্রহ্মদেশের কতকটা জয় করেছিলেন। আন্দামান নিকোবর অবধি রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

উপযুক্ত বাপ-মার উপযুক্ত সন্তান।

পাণ্ডার কথায় মায়ের ভিতরটায় বোবাকান্না দাপাদাপি করতে লাগল। ছেলের মতো ছেলে। এরকম ছেলের মা কত ভাগ্যবতী। তাঁর কি একটা এরকম ছেলে হওয়া অসম্ভব। জমাব্যথা গলে গলে মায়ের দু'চোখের কোণ ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগল। অঝোরে ঝরে ঝরে পড়ছে চোখের জল। চোখের জলেই মনে মনে পূজো করলেন মন্দিরে দেবতাকে। পুরোহিত এসে মায়ের হাতে দেবতার নির্মাল্য তুলে দিয়ে গেলেন।

নির্মাল্য মাথায় ঠেকিয়ে কর্তার মাথায় ঠেকাবেন বলে পিছন ফিরতেই দেখলেন, এক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে রয়েছেন কর্তার পাশে। হাসছেন তিনি। চোখে মুখে হাসি উপচে পড়ছে। অবাক লাগল। কান্না দেখে এত হাসি। সন্ন্যাসীর কি কারো মর্মব্যথা বুঝতে নেই।

মনের কথা তাঁর মনের কানে নিশ্চয় শুনতে পেয়েছিলেন। সন্ন্যাসী হাসতে হাসতেই বলেছিলেন, এরকম মায়ের একটা ভালো ছেলে দরকার। আমারই ইচ্ছে করছে আদর্শ মায়ের আদর খাবার জন্য মরে গিয়ে তোমাদের কাছে আসি আর একবার।

মা দেখছেন একদৃষ্টে। সন্ন্যাসী বলে কি মানুষের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে এইভাবে খোঁচা দিয়ে কথা কইতে হবে।

খোঁচা আমি দিই নি মা। সন্ন্যাসীর গম্ভীর গলা। গম্ভীর মুখ। সত্যি কথাই বলেছি। একটু চুপ করে থেকে কিছু একটা ভেবে নিলেন যেন। চোখ দুটো বড় বড় করে মায়ের দু'চোখ দেখলেন। তারপর বললেন, ছেলে হবে। নিশ্চয়ই হবে। তবে একটা সর্ত—

অফুরন্ত আনন্দের অনুভূতি শিহরণ জাগিয়ে তুলছে মায়ের সর্বশরীরে। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। চোখ দিয়ে জল ঝরছে শুধু! ছেলে হবে। যে কোনো সর্তই থাকুক না কেন—মেনে নিতে প্রস্তুত মা ছেলের বদলে।

সর্ত শোনবার জন্য মা উদগ্রীব। সন্ন্যাসীর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন।

সর্ত শোনালেন সন্ন্যাসী।—যে ছেলে আসবে সে সংসারের জন্য নয়। রাজী? কড়া জিজ্ঞাসা সন্ন্যাসীর।

যে জন্যই আসুক—তবু আসবে তো। ঘাড় নাড়লেন মা। রাজী।

জবাবটা শোনবার জন্যই যেন অপেক্ষা করেছিলেন সন্ন্যাসী। জবাব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত পায়ে চলে গেলেন সেখান থেকে।

জোড়হাত করে সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে গিয়ে, কৌটো পড়ার আওয়াজে সম্বিৎ ফিরে পেলেন মা। নিজের অগোচরেই হাতের মুঠোটা খুলে ফেলেছিলেন তিনি। বুকের ভিতর ধড়াস করে উঠল মেঝের দিকে তাকিয়ে। কৌটোর ঢাকনি খোলা। শ্বেতপাথরের মেঝেয় পড়ে আছে বৃহদীশ্বরের নির্মাল্য—শুকনো বেলপাতা-ফুল।

সযত্নে কুড়িয়ে নিয়ে কৌটোয় পুরলেন আবার। চোখের জলে প্রার্থনা জানালেন মা।—ঠাকুর ক্ষমা কর! শেখরকে সুখী কর।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন ঠাকুর ঘর থেকে। কৌটোটা বুকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। পাছে পড়ে যায়। চন্দ্রশেখরের কাছে এলেন। ছেলের কপালে ঠেকিয়ে, আচকানের পকেটে রেখে দিলেন কৌটোটা। ছেলেকে হুঁশিয়ার করে দিলেন—দেখো যেন হারায় মা!

শুভলগ্ন উপস্থিত।

বর বেরুবে এবার। উৎসবমুখর প্রাসাদে আচমকা বাজ পড়ল যেন। পড়ল মা-বাপের মাথায়ও। চোখকে অবিশ্বাস করতে ইছে করছে ওদের। মনে বলছেন, না, না—এ হতে পারে না কখনো। এ হতে পরে না কখনো। সশরীরে আসতে পারে না। এতদিন অসতেন রক্ত মাংসের দেহ নিয়ে নয়। অনাসতেন সূক্ষ্মশরীরে। এ সময়েও বা তার ব্যতিক্রম ঘটবে কেন ?

কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটছে। প্রকৃতই এগিয়ে আসছে বৃদ্ধ—তাঞ্জোরের সেই পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। যাকে এতদিন গোপন করে রেখেছিলেন মা চন্দ্রশেখরের কাছে। এগিয়ে এলেন তিনি। চন্দ্রশেখরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। চোখাচোখি হল দুজনের।

মায়ের ভীরুমন অনুনয় করতে লাগল সন্ন্যাসীকে মনে মনে। ওর শুভলগ্নে বাধা দেবেন না দয়া করে। আশীর্ব্বাদ করুন—শেখর সুখী হক।

পিছু ফিরলেন সন্ন্যাসী।

এগুতে লাগলেন সামনের দিকে। অনুসরণ করে চলল চন্দ্রশেখর।

মায়ের ভিতরে ঘূর্ণিঝড় বইতে লাগল। ঝড়ের মধ্যে থেকেই সন্ন্যাসীর অনেক আগের বলা কথার প্রতিধ্বনি শুনতে লাগলেন মা। ···সংসারের জন্য নয়।

অস্ফুটে মায়ের মুখ দিয়েও বেরিয়ে এলো—সংসারের জন্য নয় শেখর।

৬

জাফরি ঘেরা বারান্দার ভিতর থেকেই দেখল মানুষটাকে ঊর্মিলা।

মানুষটার অপলক চোখের চাউনি দোতলার বারান্দায় নয় কেবল, পুরনো ঝরঝরে বাড়ীটার হাড়-পাঁজরা ভেদ করে যেন কোথায় গিয়ে আটকে পড়ছে মাঝে মাঝে। জাফরির এক ফাঁকে চোখ সরিয়ে সরিয়ে দেখেছে।

ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছে না। এ কে—কেন এখানে? কেন অনুসরণ করে চলেছে তাকে? এ বাড়ীতে তো আর ক'টা দিন আছে মাত্র ঊর্মিলারা। এরকম সময় এমন লোকের হঠাৎ আবির্ভাবে কেমন অস্বস্তি বোধ করছে।

অবাক হয়ে যাচ্ছে। রাস্তা পেরুবার চেষ্টা করছে লোকটা। ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় ফিরিয়ে গাড়ীগুলোর গতিপথ দেখে নিল ভালো করে। এগুচ্ছে সামনের দিকে। ঊর্মিলাদের বাড়ীর দিকে।

বারান্দা থেকে চলে এলো ঊর্মিলা ঘরের ভিতর।

পা ঝুলিয়ে বসল চারপাই-এর ওপর। জাফরিব দিকে চোখ ফেরাল। লোকটা আসবে সদর দরজা পর্যন্ত। বন্ধ দরজা দেখে ফিরে যায়, না কড়া নেড়ে কাছে ডাকে বাসিন্দাদের—সেটাই দেখবার বিষয়। ডাকলে নীচে নামবে। দুঃসাহসী লোকটার মোকাবিলা করতে পিছপা হবে না একটুও।

ঊর্মিলার ভিতরে সংশয়ের দানা বাঁধছে লোকটাকে ঘিরে। যদি সত্যিই কোন কাজ থাকত তার কাছে ওর, তাহলে অনেক সময়ই পেয়েছিল জানাবার। জানায় নি। যখুনি সুযোগ পেয়েছে তখুনি বোকা বোকা মুখ করে তাকিয়ে থেকেছে স্রেফ তার দিকে আর পিছু পিছু ঘুরেছে বাড়ী না আসা অবধি।

এই দেখা আর ঘোরা পর্ব চলছে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধরে। বাড়ী থেকে বেরুবার একটু পরেই। মাকে নিয়ে উর্মিলা টাংগায় চেপে চলেছিল গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে। বোশেখী পূর্ণিমায় মুণ্ডন করবে মা। পথে সামনাসামনি টাঙায় দেখা লোকটার সঙ্গে। ওর টাঙা আসছিল, ঊর্মিলাদের যাচ্ছিল!

ঊর্মিলাকে দেখেই চেয়ে রইল। চোখ আর ফেরায় না! পলক আর পড়ে না। এ এক বিড়ম্বনা। পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে আদেশ করল ঊর্মিলা সইসকে। লোকটাও তার সইসকে গড়ীর মুখ ঘোরাতে বলল।

ঊর্মিলাদের সঙ্গম মুখো গাড়ীটা ছুটছে। নাগাল পাচ্ছে না পিছনের টাঙাটা। পাল্লা দিয়ে চালাবার জন্য সইসকে উত্তেজিত ক'রে তুলল লোকটা।

—বুড্ডে ঘোড়ে, বাচ্চে সইস, টুটি হুয়ি গাড়ী। জো হোনেকা হ্যায় উয় হোতা।

সইস সওয়ারীর বিদ্রূপ সইতে না পেরে ঘোড়ার পেটে সজোরে একটা লাথি মেরে বসল। দ্বিগুণ বেগে ছুটতে লাগল ঘোড়াটা। এলোমেলো চলছে টাঙা। সাইকেলরিক্সাটা তড়িঘড়ি পাশের রাস্তা না ধরে ফেললে সংঘর্ষ ঘটতে দেরী হত না একটুও।

পথচারী সওয়ারী আর অন্য সইসদের বাক্যবাণের বর্ষণ চলতে লাগল ছোট সইসের ওপর।

প্রাণপণে আলগা লাগাম টেনে ধরল সে। মন্থর হ'ল গাড়ীর গতি। উর্মিলাদের গাড়ীর বরাবর চলছে এবার। উর্মিলা শুনতে পাচ্ছে সওয়ারীর গলা।—ঠিকসে চলো! নহী তো খোপরা তোড় দুঙ্গা।

ফিরে তাকাল উর্মিলা। চোখাচোখি হ'ল সওয়ারির সঙ্গে। মুখে বকছে সইসকে। সইসের মাথা ভাঙছে বটে, কিন্তু তার দিক থেকে দুচোখের নড়চড় দেখতে পাচ্ছে না একচুলও।

ভালো লাগছে না মানুষটাকে। কেবলি মনে হচ্ছে একটা আপদ বুঝি পিছু নিয়েছে, বিষম অনর্থ ঘটাবে বলে দুর্ভাগ্য আসে না একা। অনেক সঙ্গী-সাথী নিয়ে আসে।

উর্মিলা এক নিদারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে চলছে। পিতৃভিটে ছাড়তে হবে মনে হ'লে, হৃৎপিণ্ডটাকে যেন পিষে ফিলতে থাকে কে। কিন্তু তবুও ছাড়তে হবেই। এই ভিটের মাটির সঙ্গে প্রাণ মন মিশে আছে তার। ভাঙা নড়বড়ে বলে পাথরের বাড়ীটা মায়ের মতোই দু'হাত বাড়িয়ে বুকে আঁকড়ে ধরেছিল এতদিন। সে-ও একদিন গেছে, আবারো আর একটা ভয়ংকর দিন এগিয়ে আসছে তার সামনে। পথে দাঁড়ানোর দিন!

'শিল্পায়ন' করতে নেমে, অনেক ঝড়ঝাপটা সহ্য করতে হয়েছে তাকে। অনেক রকম মনের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়েছে। দেখেছে যেমন, চিনেছেও তেমন অনেককে।

এসেছে অশুভ বুদ্ধির মানুষ। লালসার শ্যেনদৃষ্টি দিয়ে দেখেছে তাকে। তার রূপযৌবনের মহিমা কীর্তন করেছে পঞ্চমুখে। উপদেশ দিয়েছে কারো ঘরনী হ'তে, ভিক্ষুনী হ'তে নয়। ভিক্ষে-দুঃখু করে 'শিল্পায়ন' চালাবার ব্যর্থ আশা মনে পুষে না রাখাই ভালো।

উর্মিলা দেখেছে উপদেষ্টাকে বড় বড় চোখ করে। শুনেছে তার কথা নির্বাক মুখে। তারপর দু'চোখের আগুন আগন্তুকের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিয়ে উঠে চলে গেছে।

অপমান-অগ্রাহ্যের আগুনের জ্বালায় ছটপট করে উঠেছে আগন্তুক। জ্বালা উপশমের জন্য ঊর্মিলার সুনামে দুর্নামের কালি ছিটতে বিবেকে বাধেনি একবারের জন্যও।

এরকম ঘটনা একটা আধটা নয়—ঊর্মিলার এই তিরিশ একতিরিশ বছর বয়েসের ভিতর বহু ঘটেছে। কোন প্ররোচনাই তাকে টলাতে পারে নি। তার 'শিল্পায়ন'কেও নড়াতে পারেনি।

অতি বড় শত্রুকেও অনেক সময় বলতে শোনা গেছে—ঊর্মিলা সাংঘাতিক শক্ত মনের মেয়ে। মন দেখার চোখ থাকলে দেখা যেত, ইস্পাত দিয়ে তৈরী ওর মন। এ অপবাদটা ঊর্মিলার পক্ষে আশীর্বাদ। অবিশ্যি আপনজনের কাছে তাই বলে হেসে কুটি কুটি হত। তবু কাছে কেউ আসবে না আর মন নরম করতে।

'শিল্পায়নে' কেউ উৎসাহ দেয় নি। কেউ সহায়তা করে নি বললে সত্যের অপলাপ করাই হবে। উৎসাহ দিয়েছে অনেক বাড়ির গিন্নীরা। সহায়তা করেছে অনেক কর্তা-গিন্নী—দু'জনে মিলে মেয়েদের ছুঁচের কাজ শেখাতে পাঠিয়ে দিয়েছে ঊর্মিলার কাছে মাসের পর মাস। অভিভাবক-অভিভাবিকাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছে ঊর্মিলা, পরিশ্রমের বিনিময়ে মাইনেটাই মস্তবড় সাহায্য। এতেই ধীরে ধরে বড় হয়ে উঠবে তার শিশু প্রতিষ্ঠান একদিন না একদিন।

বড় হয়ে উঠছিল বেশ। হঠাৎ ভেঙে গেল মাঝ পথে ঊর্মিলার স্বপ্নের সৌধ।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল ঊর্মিলা।

ঊর্মিলার সীমার মধ্যে যারা ধরা ছিল, তাদের সকলেরই হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন করে নিয়েছিল। তার স্বপ্ন ভেঙে যেতে, অন্য বিয়ের সাহায্য করতে পারে নি অনেকে নিজেদের অক্ষমতার দরুণ। তবুও চোখের জলের অর্ঘ দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে কৃপণতা করে নি কেউ।

এটাও হয়তো চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে অতীতের মত-বিরোধী আকাংখিতদের ভিতর কারো কারো। হয়তো এদেরই মধ্যে থেকেই কেউ না কেউ লোকটাকে এই ভাবে অনুসরণ করে চলতে নির্দেশ দিয়েছে। চোখে চোখে রেখো ঊর্মিলাকে। একেবারে নজরবন্দী। লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হবে ঊর্মিলা তা হলে। এতদিনের অবহেলা আর অসম্মান করার ফল বুঝতে পারবে মর্মে মর্মে।

লোকটার হাবভাবে সেই ইংগিতই পাচ্ছে যেন। রাগে ফুঁসছে ঊর্মিলা। মনে হচ্ছে সইসের হাত থেকে চাবুকটা কেড়ে নিয়ে লোকটার পিঠের ছাল-চামড়া তুলে দেয় একেবারে। চাবুকের বাঁটের খোঁচায় দু'চোখ গেলে দিয়ে দেখার

আশা মেটায়।

ঊর্মিলার মুখানা ভয়ানক গম্ভীর হয়ে উঠল। লোকটার দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাল। ঘৃণাবিদ্বেষ তোলপাড করছে ভিতরে। আত্ম-সম্ভ্রম বজায় রাখতে জানে সে ভালো করে। মর্যাদার ভিতে ফাটল ধরাতে দেবে না কাউকে জীবন থাকতে।

মর্যাদার লডাইয়ে হার মানতে চায় নি বলেই শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়েছিল এক সময়। শাশুডী দেওর অনেক অনুরোধ উপরোধ করেছিল থাকতে। থাকে নি ঊর্মিলা। রাতদুপুরে স্বামীর হাত ধরে বেরিয়ে এসেছিল বাড়ী থেকে।

মদের নেশায় মত্ত অবস্থা তখন স্বামীর। কথা এডিয়ে যাচ্ছে। সর্বশরীর টলছে। দেহের অনেক জায়গায় ক্ষত হয়ে গিয়ে রক্ত ঝরছে। মেরেছে দেওর, মেরেছে শ্বশুর। মায় দরোয়ান পর্যন্ত বাদ যায়নি ওর গায়ে হাত তুলতে। একটা বিবেক-মৃত অবস্থার লোকের ওপর কি অমানুষিক অত্যাচার না করল সেদিন বিবেকবানেরা।

এতটা দাঁড়াবে ধারণার বাইরে ছিল তার। কিছুটাও আভাস যদি পেত আগে, তা হলে সবার বারণ সত্ত্বেও, নিজের জিদ বজায় রাখবার জন্য লখিয়াবাই-এর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হত না কখনো।

শ্বশুর বারণ করেছিল, দরকার নেই বৌমা। জাহান্নমে যাক ও। ও নোংরা পাড়ায় যাওয়া তোমার উচিত হবে না। এ ঘরের বৌ হয়ে···বিশেষ করে ওখানে···মান ইজ্জতের ব্যাপার এটাই।

মান ইজ্জতের ব্যাপার এটাই—ওকে ওখান থেকে সরিয়ে আনা বেলেল্লাপনা করতে আর না দেওয়া। শ্বশুরের মুখের ওপর বলেছিল ঊর্মিলা।

ঊর্মিলার মাথায় একটা পাগলা জিদ চেপে গেছল সে সময়। জিদটা দিনে দিনে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। আর সেটা হয়েছে শ্বশুরের বিমর্ষ মুখ দেখে দেখে।

শ্বশুর ঘরে এনেছিল তাকে অনেক আশায় বুক বেঁধে। শ্বশুরের মুখের দিকে তাকালেই মনে পড়ত কেবল আগেকার কথাগুলো।

কনে দেখতে এসেছে শ্বশুর। ঊর্মিলাকে দেখে সাক্ষাৎ মেনকার মেয়ে গৌরীকেই দেখল একেবারে! আনন্দে সকলের সামনেই বলে উঠল—এই মেয়েই ফেরাতে পারবে আমার কুন্দনলালকে। তবে হ্যাঁ, কুন্দনলাল মহাদেব নয়। মহাপাতক সে। দুটো ছেলে মরে যাবার পর ও। তাই শতসহস্র দোষ ওর চোখ বুঝে উপেক্ষা করেছে গিন্নী। বলেছে, দস্যি দুষ্টু হয়ে বাঁচে যদি বাঁচুক কুন্দন।

গিন্নীর প্রশ্রয়ে প্রশ্রয়ে পাষণ্ড হয়ে উঠেছে কুন্দন। বেপরোয়া বেহায়া। বড় হলে স্বভাব শোধরাবে ভেবেছিল হিতাকাংখীরা। কিন্তু ফল দেখা গেল উল্টো, স্বভাব তো শুধরোয়নি-ই বরং বেড়েছে আরো। নানা উপসর্গও দেখা দিয়েছে। বাইজী আর মদের নেশায় বিবেক পর্যন্ত হারিয়েছে। গিন্নী সব জেনে শুনেও, ছেলেকে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য নাকি লুকিয়ে চুরিয়ে, টাকা দিয়ে দিয়ে ওর অপকর্মের ইন্ধন যুগিয়ে আসছে। প্রতিবাদ করলে একেবারে মোক্ষম যুক্তি। ওকে যদি সবাই ঘেন্না করে, তাহলে স্বয়ং যমও দু'চক্ষে দেখতে পারবে না। গা ঘিন ঘিন করে সে নিজেই মরবে। ও আমাদের ঘরজোড়া করে বেঁচে থাকবে।

মাকে ছেলের গুণকাহিনী শুনিয়ে, জিজ্ঞেস করেছিল শ্বশুর—নিছক মেয়ের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য এই ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী আছে কি না।

জবাব দিয়েছিল মা। এরকম সরল বাপের ছেলে কি খারাপ হতে পারে কখনো? খারাপ হলেও, বেশীদিন থাকে না। সাবিত্রী যদি বুদ্ধির জোরে মরা স্বামীকে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে পারে, ঊর্মিলা একটা উচ্ছৃঙ্খল স্বামীকে বশে আনতে পারবে না নিজের বুদ্ধির জোরে?

এক মুখ হেসে বলেছিল শ্বশুর। সেই আশায় তো আসা। ঊর্মিলার চিবুক ধরে, আদর করে প্রশ্ন করেছিল, কি গো মা পারবে না?

কথা না কয়ে মুখ টিপে হেসেছিল শুধু অষ্টাদশী সুন্দরী ঊর্মিলা।

ছেলেকে ঘরমুখো করার জন্য সব বিষয়েই স্বাধীনতা দিয়েছিল শ্বশুর ঊর্মিলাকে।

স্বাধীনতার অপব্যবহার করেনি একটুও ঊর্মিলা। স্বামীকে অনুনয় বিনয় করেছে রাতে বাড়ী থাকতে। রুখতে পারে নি। ব্যর্থ হয়েছে চেষ্টা। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে প্রতিদিন জানলার ধারে বসে বসে দু'চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে কেবল নিজেরই। স্বামীর অন্তর গলাতে পারে নি এক মুহূর্তের জন্যও। পাষাণ মনকে টেনে আনতে পারেনি তার দিকে। বুঝেছে এ মানুষকে এসবে আটকানো যাবে না। এতদিন ধরে পণ্ডশ্রম হয়েছে শুধু তার। অন্যপন্থা অবলম্বন করেছে।

বেরুবার সময় সামনে দাঁড়িয়েছে। পথ আটকেছে। যেতে দেবে না। ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেছে কুন্দন। এই ভাবে রোজ পথরোধ করায় হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে গেছে দু'জনের ভিতর। তবু কুন্দনকে বশে আনতে পারে নি ঊর্মিলা।

শ্বশুরের মুখের হাসি শুকিয়েছে। ঊর্মিলার সঙ্গে দেখা হলে মলিন মুখ আরো

মলিন হয়ে ওঠে। বুকভাঙা দীর্ঘনিশ্বাস ঝরে পড়ে। ঊর্মিলার ভিতরে হাহাকার করে ওঠে।

আপসোস করে বহুবার বলেছে শ্বশুর, নিজের ছেলেকে ফেরাতে গিয়ে, একটা মায়ের মেয়ের জাবন নষ্ট করে দিলুম নিজে হাতে। এর প্রায়শ্চিত্ত কি করে হবে আমার।

সান্ত্বনার শান্তিবারি ছিটতে চেষ্টা করেছে ঊর্মিলা শ্বশুরের মাথায়। বাবূজী প্রায়শ্চিত্ত করতেই বা যাবে কেন অকারণে। অপরাধা ঊর্মিলা। যদি কাউকে প্রায়শ্চিত্ত করতেই হয়, তা ঊর্মিলাকেই করতে হবে। সাবিত্রীর মতো বুদ্ধির জোর কোথায় তার? মনে পড়ে যেত মায়ের কথা। সাবিত্রী যদি বুদ্ধির জোরে মরা স্বামীকে···নিয়ে আসতে পারে উচ্ছৃঙ্খল স্বামীকে বশে নিজের বুদ্ধির জোরে? শ্বশুরের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথাও কানে ভেসে আসত। কি গো মা পারবে না?

ঊর্মিলার ঘা খাওয়া মন কেমন যেন চনমনে হয়ে উঠত। হতাশায় ঝিমিয়ে পড়া মন যে হঠাৎ এত জোরাল হয়ে উঠত কোথা থেকে বুঝতে পারত না। মাথার মধ্যে একটা কথাই খালি ঘুরপাক খেত। পারবে। নিশ্চয়ই পারবে।

শেষ চেষ্টা ঊর্মিলার। মন্ত্র সাধন কি শরীর পতন। সব হয়ে গেছে তার। লখিয়াবাই-এর বাড়ী যাওয়াটাই বাকি শুধু।

লখিয়াবাই-এর বাড়ী থেকে তুলে আনবে তার স্বামীকে। না পারলে আত্মঘাতী হবে সে। আপত্তি সত্বেও জিদে অচল অটল দেখে, মত দিয়েছিল শ্বশুর বাধ্য হয়ে।

গেছল লখিয়াবাই-এর বাড়ীতে ঊর্মিলা।

লাল ফরাশের ওপর তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছে লখিয়াবাই-এর গুণমুগ্ধরা। সারেঙ্গীর সুরে গলা মিলিয়ে গাইছে লখিয়াবাই। কিধার হ্যাঁয় তেরে দিল, কিধার জা রহে হ্যাঁয়·· কোথা থেকে আসে অন্তর তোমার ফিরে যায় কোথায় আবার, যেথা থেকে আসে লাঞ্ছনা সয়ে—ফিরে যেতে চায় সেথা আবার। শ্রোতার দল মাথা দোলাতে দোলাতে বাহবা দিচ্ছে জড়ানো কথায়। কুন্দন চোখ বুজে মুখ বুজে দুলছে খুব। এও এক ধরনের গানের তারিফ করা হয়তো।

সাদা সিল্কের ওড়নায় আপাদমস্তক ঢাকা ঊর্মিলার। দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সব। পাতলা ওড়নার ভিতর দিয়ে দেখছে লখিয়াবাইকে। দেখছে কুন্দনকে। নিজের ভাবে এত বিভোর ওরা, ঊর্মিলার দিকে কোনো লক্ষ্য নেই। লক্ষ্য পড়ল সামনের দিকে মুখ ফেরাতে লখিয়াবাই-এর।

ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় লখিয়াবাই-এর হীরের নাকছাবিটা ঝকমক করে উঠল। নানা রঙের আলো ঠিকরে ঠিকরে পড়তে লাগল ঊর্মিলার ওড়না ঢাকা মুখে।

এগিয়ে এলো লখিয়াবাই-এর সামনে ঊর্মিলা। আত্মপরিচয় দিয়ে, দৃঢ়কণ্ঠে জানাল, সে তার স্বামীকে নিয়ে যাবে এখান থেকে এখুনি। সুরের রাজ্য থেকে অসুরের রাজ্য নেমে পড়ল লখিয়াবাই সঙ্গে সঙ্গে। যে মেয়ে এসে তার সুরের ছন্দ কেটে দিয়েছে মাঝ-পথে, সে ক্ষমার অযোগ্য লখিয়াবাই-এর কাছে। তাকে আর দেরী না করে গলা ধাক্কা দিয়ে ঘরের বাইরে, বাড়ীর বাইরে বার করে দেওয়া উচিত।

মুখ থেকে কথা খসবার সঙ্গে সঙ্গে লখিয়াবাই-এর অনুচররা এগিয়ে এলো ঊর্মিলার কাছে। অনেক কটুকাটব্য করল তারা ঊর্মিলাকে। রাতে যে মেয়ে এখানে আসে, সে কেমন ধারা তা আর বুঝতে বাকি আছে নাকি কারো। বেশ তো মুখের ওড়নাটা সরিয়ে দেখলেই সব ঝামেলা চুকে যায়। সুন্দরী হলে থাক। নইলে দূর করে দেওয়া হক। রাগে ঠক ঠক করে কাঁপছে ঊর্মিলা। তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল—ওড়না খুলতে হয় ওই ভদ্রলোককে বলুন না। ওর দু'চোখে জলের ছিটে দিয়ে ঝিমুনিটা কাটিয়ে দিন না।

পাশ থেকে এক জন টিপ্পনী কাটল—ওরে বাব্বা! গলার জোর আছে বেশ! রোখ দেখ না! কুন্দনকেই চায় ও। ভালো ভালো! পছন্দসই মানুষ বটে কুন্দন। তাছাড়া আমীরওমরহ লোকও তো বটে।

ওড়নাঢাকার ভিতরে দু'হাত নিশপিশ করে উঠছে ঊর্মিলার। লোকটার দুগালে কষে চড় বসিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

কুন্দনকে আসতে দেখে, সংযত করে নিল নিজেকে। একজন টেনে নিয়ে আসছে ওকে।

কাছে এসে মুখের ওড়না খুলে দিয়েই হতভম্ব হয়ে গেল কুন্দন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল খানিক। ভালো করে চোখ রগড়ে রগড়ে দেখল। ভুল দেখছে কি ঠিক দেখছে। তারপর ঊর্মিলার ডান হাতখানা সজোরে চেপে টেনে নিয়ে চলল বাইরে।

বাড়ী এসে তুলকালাম করেছে বাবার সঙ্গে, ভায়ের সঙ্গে, ঊর্মিলার সঙ্গে। কেন ঘরের বৌ বাইরে যাবে। সবাইকে দেখে নেবে সে। বাপ-ভাই বৌকে ভোরে উঠে আর দেখতে পাবে না কেউ।

শাসানিটা যদি স্রেফ মুখের কথাতেই আটকে থাকত তাহলে কোন গণ্ডগোলই বাধত না আর। দুহাতে ঊর্মিলার গলা চেপে ধরল কুন্দন। শেষ না করে ছাড়বে না। এগিয়ে এলো ছাড়াতে শ্বশুর। এগিয়ে এলো দেওর। ঊর্মিলাকে ছাড়াবার

জন্য, বাঁচাবার জন্য একটুও ইতস্তত করে নি যেখানে সেখানে আঘাত করতে কুন্দনকে। কুন্দন ছেড়েছে ঊর্মিলাকে। দরোয়ান দিয়ে বার করে দিয়েছে শ্বশুর ছেলেকে।

এক এক করে শ্বশুরের দেওয়া সমস্ত গয়না খুলে ফেলেছে ঊর্মিলা। তারপর খোলা গয়না আর তোলা গয়নার বাক্সটা সুদ্ধু শ্বশুরের পায়ের কাছে ধরে দিয়ে প্রণাম করে এক কাপড়ে বেরিয়ে গেছে বাড়ী থেকে। স্বামীর হাত ধরে লক্ষ্ণৌ থেকে এলাহাবাদে মায়ের কাছে এসে উঠেছে।

ছেলেকে ছাড়তে চেয়েছিল শ্বশুর চিরকালের জন্য। কিন্তু ছেলের বৌকে ধরে রাখতে চেয়েছিল বরাবরের জন্য। বলেছিল, বৌমা! ও যাক! তুমি আমায় ছেড়ে যেও না।

কান্নাভেজা গলায় বলেছে ঊর্মিলা, যেখানে দরোয়ান দিয়ে মারতে মারতে বার করে দেওয়া হয়েছে ওকে—সেখানে তাকেও ওই সঙ্গে ওই ভাবে বার করে দেওয়া হয়ে গেছেই।

শ্বশুর বাড়ী ছেড়ে চলে এলেও, ঊর্মিলার সাধনা যে সার্থক হয়েছে একথা বলতেই হবে। স্বামীকে কাছে চেয়েছিল, পেয়েছে। স্বামীর মন-আত্মা ওর মন-আত্মায় বাঁধা পড়েছে। সুরা ছেড়েছে স্বামী। ছেড়েছে লখিয়াবাই-এর সুখ স্বপ্নের নেশাও। ঊর্মিলাকে না দেখতে পেলেই দিশেহারা হয়ে পড়ে।

ঊর্মিলা কিন্তু স্বামীকে দেখেই দিশেহারা হয়ে পড়েছিল একদিন হঠাৎ। স্বামীর দিকে ভালো করে লক্ষ্য করতে বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। কষ্টিপাথরের মতো কালো মানুষটা সাদাটে হয়ে গেছে যেন। ধার কর্জ করে ডাক্তার বৈদ্য দেখিয়েছে। রক্ত শূন্যতা অসুখ সারাতে পারেনি। বাবাকে জানাবার জন্য বলেছে কুন্দনকে। রাজী হয়নি ও। বরং রেগে গিয়ে দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছে। তুমি দেখতে পারো দেখবে। না পারলে স্পষ্ট বলে দেবে। যেখানে দু'চোখ যায় চলে যাবো।

চলে যেতে দেয়নি কোথাও ঊর্মিলা কুন্দনকে। সেবা যত্ন চিকিৎসায় ত্রুটি করেনি কোনদিন ওর! বাপের কোন সাহায্য নেবে না ছেলে মরে গেলেও—শুনে এগিয়ে এসেছে জামাই-এর জন্য মা-ও। নিজের একমাত্র সম্বল ভাঙা বাড়ীটাও বন্ধক দিয়ে টাকা যোগাড় করেছে জামাই-এর চিকিৎসা পথ্যের জন্য। ছুঁচসুতোর যাদুতে জামা কাপড়ের ওপর রঙ বেরঙের বিচিত্র নক্সা তুলে মেয়েদের নক্সার কাজ শিখিয়ে যা পেয়েছে মা-মেয়ে, নিজেরা পেটে না খেয়ে সব ঢেলেছে কুন্দনকে বাঁচতে।

বাপের বাড়ী আসা থেকেই মাঝে মাঝে শ্বশুর খরাখবর নিত। ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে ছেলে-বৌকে। ওদের না যাবার ধনুকভাঙা পণ থেকে একপাও সরাতে পারে নি। অসুখ বাড়াবাড়ি হতে, মা-বাবা-ভাই এসেছে। ওদের দেখে মুখ ফিরিয়ে শুয়েছে কুন্দন।

এই ভাবেই সবার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঊর্মিলার চোখে চোখ রেখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল কুন্দন একদিন। দু'বছরের মধ্যেই বিধিলিপির নির্মম কশাঘাতে স্বামী সোহাগিনীর সোহাগন—এয়োতীর চিহ্ন মুছে গেল।

শ্বশুর-শাশুড়ীর অনেক অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও, এরপর আর ফিরে যেতে চায়নি ঊর্মিলা। জোড় হাত করে, বিনয়ের সুরে বলেছে, এখানে ও গেছে। এ ভিটে ছেড়ে কোথাও যাবো না আমি।

বিব্রত বোধ করেছে শ্বশুর। ভেবেছে, যেতে বলে ঊর্মিলার মর্মস্থানে আঘাত দিয়ে ফেলেছে। ধরা গলায় বলেছে, ঠিক আছে বেটী। ঠিক আছে। ভিটে ছেড়ে যেতে হয়নি ঊর্মিলাকে। ছেলে থাকতে যেমন আসত শ্বশুর, ছেলে চলে যাবার পরও সে ভাবটা বজায় রেখেছিল মাঝে মাঝে এসে। মেয়েদের শেখানো দেখেছে কতদিন ঊর্মিলার পাশে বসে বসে। খুশী হয়েছে খুব। শ্বশুরের খুশীর ছায়া তারও মুখে ফুটে উঠেছে। মন বুঝে কথা তুলেছে শ্বশুর। যখের ধন আগলে আর বসে থাকতে পারছে না। কেবলি মনে হচ্ছে, বেশীদিন বাঁচবে না বুঝি। ঊর্মিলাকে দেওয়া গয়না ঊর্মিলারই প্রাপ্য। আর কারো নয়।

হাসতে হাসতে বলেছে ঊর্মিলা, বাবুজী, কিছু চাইনে আমি। তোমার আশীর্বাদই আমার গয়না ঐশ্বর্য সব কিছু।

শিল্পায়নের নাম করেও অর্থ সাহার্য্য করতে চাইলে, ঊর্মিলার মুখে ওই একই কথা শুনতে পেত শ্বশুর। কোন বাদপ্রতিবাদ না করে, ম্লান মুখে ঊর্মিলার মাথায় হাত বুলিয়ে দিত শুধু শ্বশুর।

শ্বশুরও আজ নেই। তবে কেন মনে হচ্ছে পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে? হয়তো দুর্দিনে অতীতের স্নেহস্মৃতিকে আগোচরেই সামনে টেনে এনে সান্ত্বনার অবলম্বন খুঁজেছে সে।

শ্বশুরের জন্য ভিতরে যে রকম আকুলিবিকুলি করছে এখন—ঠিক তার মৃত্যুর সময়ও হয়েছিল। তখন মেয়েদের হাতের কাজ শেখাচ্ছে ঊর্মিলা। শেখানোয় মন বসাতে পারছে না কিছুতেই, শ্বশুরের ছল ছলে দুচোখ আর বিমর্ষ মুখখানাকে চোখের সামনে থেকে সরাতে পারছিল না শত চেষ্টা করেও। মেঘলা আকাশের দিকে চেয়েছে মন ঘোরাতে—আরো বেশী উতলা হয়ে পড়েছে। তারপর কি যে হয়েছে, কেমন করে ঘর ছাড়া হয়ে স্টেশনে এসে ট্রেন ধরে লক্ষ্ণৌতে পৌঁছেছে—

আজো চিন্তা করেও কোন হদিস পায়নি তার।

…শ্বশুরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে হতবাক হয়ে গেছে। শ্বশুর যাবার পথে। দু'চোখের দৃষ্টি আটকে পড়েছে ঊর্মিলার মুখের ওপর। মনে হল ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল একবার। কিছু বলতে চেষ্টা করল বুঝি। পারল না। অবোল হয়ে গেছে। দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল শ্বশুরের।

ঊর্মিলার চোখের কোণ জ্বালা করে উঠছে। তিন বছরের আগের লোকটা নতুন করে যন্ত্রণা দিতে সুরু করছে আবার।

পাশাপাশি দুটো টাঙা চলছে। ঊর্মিলার তাকাতে ইচ্ছে করছে না আর ও টাঙার সওয়ারীটার দিকে। না তাকিয়েই বেশ অনুমান করতে পারছে লোকটা একদৃষ্টে দেখছে তাকে এখনো।

গন্তব্যস্থলে এসে টাঙা দুটো থামল একসঙ্গেই। মা আর ঊর্মিলা দু'জনে নেমে পড়ল তাড়াতাড়ি। লোকটা কিন্তু নামল না। বসেই রইল টাঙায়। হয়তো অনেক লোক দেখে এই ব্যবস্থা।

মায়ের মুণ্ডন সারা হলে, এক গোছা চুল নিয়ে গঙ্গাযমুনার মিলনের জলে ডুবিয়ে দিল। ইচ্ছেটা ছিল মায়ের অনেক দিন ধরে। বাড়ী ছেড়ে কোন অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে হবে কোথায় কে জানে। আগে থেকেই তাই সেরে নেওয়া হল মুণ্ডনটা।

গাড়ীতে এসে বসেছে মা-মেয়ে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও, পাশের টাঙার লোকটার চোখে চোখ পড়েছে আবার। একই ভাবে বসে আছে। নির্জীব পাথরমূর্তি একেবারে। কিন্তু চোখ দুটো সজাব-সচল। ওপর-নাচে করছে কেবল। ঊর্মিলার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি দেখছে বারবার। দেখে দেখেও দেখার সাধ যেন মিটতে চাইছে না আর।

পশ্চিমের খেয়ালী বাতাসে ঊর্মিলার কালো কুচকুচে কোঁকড়ানো এলোচুল গাল-কপাল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ছে। হাত দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে ঊর্মিলা। পাশের টাঙার পাথরমূর্তিটা নড়ল এবার। বেহায়া নির্লজ্জের মতো ঝুঁকে পড়ে চুল সরানো দৃশ্যটা দু'চোখ দিয়ে গিলতে লাগল যেন। ঊর্মিলার নিজের ওপরেই বিরক্ত এলো। মায়ের মতো মাথা মুড়িয়ে চুলগুলো সঙ্গমের জলে ফেলে দিয়ে এলো না কেন সে।

আমি বেঁচে থাকতে এদৃশ্য দেখতে পারবো না রে। মরলে যা হয় করিস! মায়ের এসব কথা না শুনলেই ভাল করত সে।

টাঙাগাড়ী চলছে। গতি বাড়ছে ধীরে ধীরে। লোকটার গাড়ীও তালে তাল মিলিয়ে চলছে ঊর্মিলাদের গাড়ীর সঙ্গে।

বাড়ীর কাছ বরাবর আসতেই গাড়ীটা রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। নিশ্চয়ই সওয়ারীর ইংগিতেই দাঁড়াল গাড়িটা। লোকটা নামল। এপারের গাড়িটার ওপর চোখ রেখে ওপার ধরেই এগুচ্ছে।

লোকটা গাড়ী ছেড়েছে। সঙ্গ ছাড়েনি। এটা অদ্ভুত ঠেকছে ঊর্মিলার কাছে। হয়তো গাড়ীসুদ্ধু ধরা পড়লে পালানো অসুবিধে—তাই এই নীতির আশ্রয়।

বাড়ীর সামনে এসে টাঙা থেমেছে ঊর্মিলাদের। তাড়াতাড়ি নেমে পড়েছে মা-মেয়ে। ভিতরে ঢুকেই দরজায় খিল এঁটে দিয়েছে ঊর্মিলা। ওপরে উঠেছে এরপরে। জাফরি ঘেরা বারান্দা থেকে দেখেছে লোকটাকে। ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ীর দিকে তিক্ষ্ণদৃষ্টি।

বারান্দা থেকে ঘরে এসেছে। চারপাই-এ বসে চোখ ফিরিয়েছে জাফরির চারকোণা ফাঁকে। লোকটা এগিয়ে আসছে বাড়ীর দিকে। উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করছে ঊর্মিলা সদর দরজায় কড়াটা নড়ে উঠছে কিনা।

প্রতীক্ষার অবসান হতে বেশী লাগল না ঊর্মিলার। কড়ানাড়ার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে।

রাগে সর্বশরীর জ্বলে উঠল। লোকটাকে উচিত মতো শিক্ষা দিতে হবে। উঠে পড়ল চারপাই থেকে। দরজা খুলে মা-ই লোকটার সংগে কথা কইতে চেয়েছিল। ঊর্মিলাকে নীচে যেতে বারণ করেছিল। মায়ের নিষেধ না শুনেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে ঊর্মিলা। তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে, দরজা খুলে দিয়েছে। লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সোজা হয়ে। ইতর অভদ্র বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান—অনেক কিছু বলবার জন্য অনেক ভাষাই মুখে যুগিয়েছিল। কিন্তু একটা কথাও বেরয় নি। কথার আদি অক্ষরটা পর্যন্ত না।

ওর ওপরে ঊর্মিলার ধারণা বুঝতে পেরেছিল যেন লোকটা। ঊর্মিলার মুখের ওপর থাপ্পড় মেরেছিল একটি মাত্র শব্দে—বহিন! বহিন! বিশেষ জরুরী কাজে এসেছি আপনার কাছে। ক্ষমা করবেন অসময়ে বিরক্ত করার জন্য।

মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল ঊর্মিলার একেবারে। ঊর্মিলা বিস্মিত চোখে দেখছিল ওর দু'চোখ। দুঃসময়ে মতিবিভ্রম হয় মানুষের। অকারণ এতক্ষণ ধরে একটা অত বড় ভদ্রকে কত ভুল না ঠাউরেছে! বিস্ময়ের সামা পরিসীমা রইল না ঊর্মিলার—যখন আগন্তুক দেবীপ্রসাদ তার সমস্ত কথা শোনাল।

দেবীপ্রসাদ দেশে ছিল না এতদিন। আমেরিকায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে গেছল। শিকাগোর গ্র্যাণ্ডপার্কে বাকিংহাম ফোয়ারা দেখছিল যখন—আলো আর ফোয়ারার জলের মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে একটা তন্ময়তা এসে গেছল দেবীপ্রসাদের—ঠিক সেই সময় ঊর্মিলাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে

দেখেছে স্পষ্ট।

দেখাটার কোন গুরুত্বই দেয় নি প্রথমে। দ্বিতীয়বার ইলিনয়স রাজ্যের প্রাচীন পাখী জন্তু আকারের ঢিবিগুলো দেখে অর্ত তে ফিরে যাচ্ছিল। যেতে যেতে এমন জায়গায় পৌছল, যেখানে কেমন যেন হয়ে গেল। আশ্চর্য! এবারেও ঊর্মিলাকে দেখল। তবে ঊর্মিলার মুখখনায় ঘন বিপদের ছায়া নেমেছে এবার একই মেয়েকে অদ্ভুত ভাবে দু'বার দেখল। দেখল তার কায়া নয়। স্বপ্নের মূর্তির মতো! এরকম চেহারার কোন মেয়েকে আজ পর্যন্ত দেখে নি। অথচ দেখেছে। কেন?

বন্ধুবান্ধবকে জানিয়ে ছিল। তারা হেসেছে। বিদ্রূপ করে নানা কথা বলেছে। অনেকে মাথা খারাপের লক্ষণও দেখেছে নাকি তার ভিতর।

হঠাৎ বাবা মারা যাবার পর স্বপ্নে ঊর্মিলাকে দেখতে লাগল প্রায় রোজই। লক্ষৌতে এসে আবার বাবার সঙ্গে ঊর্মিলাকে দেখতে পেত স্বপ্নে। তিনচারদিন আগে সারারাত ধরে দেখেছে একই স্বপ্ন। শেষের দিনে দেখল একটা নতুন জিনিস। বাবা আর ঊর্মিলার মাঝখানে একটা কাজ করা গয়নার বাক্স। দেখে, ঘুমুতে পারে নি একদম, চোখের পাতা এক করতে পারে নি এক বারের জন্যও। শেষে উঠে পড়েছে বিছানা থেকে। ভিতরটায় অস্থির অস্থির করছিল বড্ড। ঘরময় পায়চারি করছিল ঘন ঘন। কেন করছিল, কেন তার অমন হচ্ছিল—কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না।

স্ত্রী সব শুয়ে শুয়ে লক্ষ্য করেছে। দেবীপ্রসাদের মুখে স্বপ্নকথা শুনে চমকে উঠেছে। মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে স্বীকার করেছিল নিজের দোষের কথা। গোপন ব্যাপারের কথা। দেবীপ্রসাদের বাবার শরীরটা একটু খারাপ মনে হতে, স্ত্রীকে ডেকে বলেছিল, বাল্যবন্ধুর পুত্রবধূ ঊর্মিলার গয়নার বাক্স জমা রেখে গেছে বন্ধু মরবার ক'দিন আগে। যদি কখনো বিপদে পড়ে ঊর্মিলা, যদি তার প্রয়োজন হয়, তখন তারই প্রাপ্য জিনিস যেন দিয়ে দেওয়া হয় তাকে। বুঝিয়ে বলা হয় যেন, শ্বশুরের শেষ অনুরোধ নাকচ না করে যেন বৌমা।

একথাও অকপটে জানিয়েছিল স্ত্রী, বাবার কাছ থেকে গয়নার বাক্সটা পেতে, সত্যিই লোভ হয়েছিল খুব। ভেবেছিল, কেই বা জানতে পারবে চেপে গেলে। কিন্তু চেপে রাখবার চেষ্টা করেও পারে নি। স্বপ্ন দেখার কথা শোনা মাত্র, বুক ঠেলে ঠেলে আপনা হতেই বেরিয়ে আসছিল কথাগুলো।

স্ত্রীর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে দৌড়ে এসেছে দেবীপ্রসাদ। দেখেছে ঊর্মিলাকে। একবার নয়। বহুবার। দেখে দেখে স্বপ্নের মেয়ের চেহারার সঙ্গে

প্রতিটি অঙ্গ মিলিয়েছে উর্মিলার। নিখুঁত ভাবে মিলে গেছে। এখন বহিনের গচ্ছিত জিনিস ফেরত আনবে বলে জানাতে এসেছে।

বিস্ময়ের ঘোর কাটছে উর্মিলার। মনে হচ্ছে শ্বশুর একবার বলেছিল··· উর্মিলাকে দেওয়া গয়না উর্মিলারই প্রাপ্য। আর কারো নয়। মনে পড়ছে, স্বামী মারা যাবার পর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল শ্বশুর। উর্মিলা বলেছিল, এখানে ও গেছে, এভিটে ছেড়ে কোথাও যাবো না আমি। শ্বশুর বলেছিল, ঠিক আছে।

সুদে আসলের দায়ে বাড়ীটা বিক্রি হয়ে যাবে আর দিন সাতেক বাদে। এমন সময়—

ছেলেমানুষের মতো মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ফোঁপাতে লাগল উর্মিলা। উর্মিলা বেশ অনুভব করছে, শ্বশুর যেন মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আস্তে আস্তে।

উর্মিলার মুখে তার জীবনের অভাবনীয় ঘটনা শুনে আমি স্থাণুর মতো বসেছিলুম চুপচাপ।

৭

পরদাটা থেকে থেকে নড়ে উঠছে। পিছন থেকে কেউ যেন সরাবার চেষ্টা করছে। যে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে তার আলগা মুঠোয় পরদার মাঝখানের কিছু অংশ চলে যাচ্ছে, আবার সরেও আসছে সঙ্গে সঙ্গে।

অদ্ভুত ব্যাপার। কেউ ভিতরে আসছে না, আসবার কথা বলছেও না মুখে। আমার জিদ বাড়ছে, নিজে হতে ডাকব না কিছুতেই। দেখাই যাক না। পরদার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছি। ডিমলাইটের আলোয় খয়েরি রঙটা কাল্‌চে দেখাচ্ছে আমার চোখে। এরকম দেখায় না কোনদিন। আজ ভরসন্ধ্যে থেকে এই ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে যখুনি ওদিকটায় তাকিয়েছি তখুনি রঙ বদলে যেতে দেখেছি। হয়তো কয়েক বছর আগের একটা নৃশংস কালো ছবির ভাবনা সারাদিন ধরে পেয়ে বসেছে বলে।

কালো ছবি। নির্মম মৃত্যু। সুবীরের মৃত্যু। সুবীরের শেষনিশ্বাস ফেলার সময় আমি দেখিনি। ওর কাছে ছিলুম না। তবে মৃত্যু যখন ওর শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে, ওকে গ্রাস করবার জন্য উদগ্রীব, তখন ওর মুমূর্ষু অবস্থা দেখেছিলুম আমি। কথা বন্ধ চোখ বন্ধ। শ্রবণ শক্তিও লোপ পেয়েছিল বোধ হয়। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জোরে জোরে ডেকেছি নাম ধরে। শুনতে পাওয়ার কোন লক্ষণই প্রকাশ পেতে দেখিনি ওর মুখের কোন জায়গায়। ক্ষীণ নিশ্বাস পড়ছিল। নাড়ীর গতিও ভালো নয়। হাত-পা— দেহের কোন অঙ্গই নড়তে দেখিনি। সব একেবারে শক্তিহারা। যেন একটা কাঠের পুতুল পড়ে রয়েছে লাল বাড়ির রকটার ওপর। চব্বিশ বছরের যুবকের অদৃষ্টে লেখা ছিল বোধ হয় এই ভাবে মৃত্যু।

সেদিনকার মতো আজ সকালেও মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে একপ্রস্থ। তফাৎ কেবল এবারে লাল বাড়ির রকে নয়, দক্ষিণ পাশের হলদে রঙের বাড়িটার গেটের সামনে সুবীরের বয়সী তরুণটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে ছিল। শীর্ণকায়। হাড়-পাঁজরা গোনা যাচ্ছে এক এক করে। বেচারার প্রাণটা ধুকধুক করছে তখন, বুকের বাঁ পাশটা মৃদু মৃদু কাঁপছে।

আমার বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠল। সুবীরের প্রায় এই দশাই দেখেছিলুম। সুবীরের অমন ফর্সা রঙটা সাদা কাগজের মতো দেখাচ্ছিল।

এর কালো রঙটা যেন জমাট নীল। ঠোঁট দুটোও নীলচে হয়ে আসছে। মানুষটা ভিজছে। পাড়ার ছেলেরা সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। সুবীরকেও সরিয়ে ফেলেছিল ছেলেরা লাল বাড়ির রক থেকে।

মানুষটা ক'দিন থেকেই এ পাড়ায় ঘোরাঘুরি করছে। বলেছে, ভিখিরি সে। পেটের দায়ে ভিক্ষে চাইছে। কর্মের সংস্থান করতে পারেনি কোনরকমে বহুদিন শত চেষ্টা করেও। অনাহারে অনাহারে মরতে বসেছে সে।

পাড়ার লোকের—যার যেটুকু ক্ষমতা সাহায্য করেছে প্রতিদিন। তবু ওর ভবিতব্যকে রুখতে পারল না কেউ। পেটের খাবার জুগিয়েও ক্ষীণ প্রাণের শক্তি বাড়াতে পারল না কেউ ওর। পারেনি সুবীরের বেলায়ও।

জাত ভিখিরি ছিল না সুবীর। মুখচোরা মানুষ। কারো কাছে কিছু চাইত না মুখ ফুটে। রোদ্দুরে লোকের বাড়ির দোরে বসে বসে পুড়েছে। বৃষ্টিতে ভিজেছে। কেউ কিছু দিলে, নেয়নি হাত পেতে। ছেঁড়া গামছাটা বিছিয়ে দিয়ে মাথা নত করেছে লজ্জায়।

ওকে দেখে মনে হত, ওর সব কিছুই আছে। ঘরবাড়ি—আত্মীয়-স্বজন, সব। হাজারো প্রশ্ন করেও ওর পেট থেকে কথা বার করতে পারেনি কেউ। ও কে, কোথা থেকে এসেছে, দেশ-ভিটে কোথায়—কেউ জানতে পারেনি। বেশী জিজ্ঞেস করলে, ওর দু'চোখের কোণ লাল হয়েছে। চিকচিক করে উঠেছে। বোঝা গেছে অভিমানী সুবীর দারুণ ব্যথা বুকে পুষে পথে নেমেছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে গোপনে। অনেক দূরে। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে বলে কাজ-কর্ম জানে না কিছু বোধ হয়। তাই খুঁজে পেতেও কোন কাছ যোগাড় করে নিতে পারেনি। শেষে এই পরিণতি। ঘরে না ফেরার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাই এই দুর্গতির কারণ ওর।

আমার ধারণার কথা মাঝে মাঝে বলতুম আমি ওকে। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকত ও আমার দিকে খানিক। তারপর একটু ম্লান হাসি হেসে বলত, বাবু কি জ্যোতিষ জানেন? আমার ভবিষ্যৎটা একটু বলুন না।

আমি মাথা নেড়ে জানাতুম, জানিনে।

বিশ্বাস করত না ও। হাসতে হাসতে বলত, খারাপ জানলেও ভয় পাব না আমি। আমিও হেসে চলে যেতুম আর কোন জবাব না দিয়ে। চলে গেলেও আসতুম আবার পরের দিন। আবার গল্প করতুম আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। লক্ষ্য করেছি আমি, আমাকে কাছে পেয়ে ও যেন আপনজনকেই ফিরে পেত বুঝি। আমারও ওকে খুব কাছের লোক বলেই মনে হত।

এই কাছের লোকটি চলে গেল একদিন আমায় ছেড়ে। অর্থাৎ আমাদের

পাড়া ছেড়ে। ছেলেরা সব সুবীরের কাছে দাঁড়িয়ে জটলা করছিল ওকে সরাবার জন্য। লাল বাড়ির মালিক ছেলেদের শ্মশানে নিয়ে যেতে বলল। মঙ্গলবারের মড়া অমঙ্গলই করবে। আর বাড়ির রকে বলে, তার তো করবেই, আর তাছাড়া পাড়ার কোন লোকের বাড়িই বাদ যাবে না এ অমঙ্গলের আওতা থেকে। এক এক বাড়ি থেকে মনোমত এক একজনকে নিজের দোসর করে নেবেই নেবে ও। এই অবধি কানে গেছিল। বিশেষ কাজের জন্য দাঁড়াতে পারিনি আর বেশী সময়। চলে গেছিলুম। পরে প্রায় বিকেলের দিকে এসে দেখি, রকটা শূন্য। শুনলুম, ছেলেরাই নাকি সুবীরকে নিয়ে গিয়ে শেষকৃত্য করেছে। ভিতরে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা আমার দাপাদাপি করেছিল বেশ কিছুক্ষণ ধরে!

সারাটা দিন ছটফট করেছি আমি সুবীরের জন্য। শেষ সময় আসবার চেষ্টা করেও আটকে পড়লুম আরও বেশী করে। আসতে পারিনি।

বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে।

পরদাটা বড্ড বেশী নড়ে উঠল। আকাশ ফাটানো কড়কড় আওয়াজের সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। চোখ ধাঁধানো এক ঝলক আলো ঠিকরে পড়ল ঘরে।

পরদা সরিয়ে সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকল সুবীর। আমি ভীতবিস্মিত চোখে দেখছি মৃত সুবীরকে জীবন্ত মানুষের মতো। সুন্দর দেখতে হয়েছে সুবীর। দেহটা বেশ ভারী হয়েছে। গোলগাল চেহারা। সুবীর ধবধবে দাঁত বার করে হাসছে। ভরাট গালে লাল গোলাপের আভার মাঝে টোল পড়ছে।

এসব কি দেখছি আমি! স্বপ্ন না সত্যি? বারদুয়েক চোখ বুজলুম চোখ চাইলুম। মাথাটা ঠিক আছে কি না জানবার জন্য ঝাঁকিয়ে নিলুম একবার। মাথা ঠিকই আছে। ঠিকই দেখছি। ঘুমিয়ে নয়, জেগেই।

খালি চেয়ারটার সামনে এগিয়ে এল ধীরে ধীরে সুবীর। বসল না। দাঁড়িয়ে রইল পাশে। দেখছে আমাকে একদৃষ্টে। ওর দু'চোখ অনেক কথাই বলতে চাইছে যেন। ঠোঁট দুটো নড়ে উঠছে।

বিদেহী এসেছে দেহ ধরে। অতৃপ্ত আত্মা এসেছে ঘুরে ফিরে আবার পুরনো জায়গায়। যা বলতে এসেছে, বলুক ও। ভয় পেলে চলবে না। কান পেতে শুনতে হবে। আমারই ডাকে ও এসেছে হয়তো। আমারই অস্থিরতা দূরের আত্মাকে কাছে এনে ফেলেছে বোধহয়।

কথা বলতে শুরু করল সুবীর।—লাল বাড়ির রকে আমি মারা যাইনি। সে সময় মারা গেলে আর একটা নিদারুণ অপঘাত মৃত্যুকে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হত না তাহলে আমার জন্য।

শিউরে উঠল আমার সর্বশরীর। সুবীরের মৃত্যু তাহলে স্বাভাবিক ভাবে

হয়নি। হয়েছে অপঘাতে। প্রেতাত্মা শোনাতে এসেছে তার মৃত্যু রহস্য!

আচমকা প্রেতাত্মার মুখখানা খুব কঠিন হয়ে উঠল। গলার স্বরে উত্তেজনা ফেটে পড়তে লাগল। নিজেই নিজের নাম ধরে বলল, সুবীরের ওপর পাড়ার ছেলেরা ভয়ানক নির্দয় ব্যবহার করেছে। ওকে হাসপাতালে না দিয়ে, মৃত ঘোষণা করে, শ্মশানে নিয়ে যাবার নামে নিয়ে গেছিল হাওড়া ময়দানে। ময়দানের পূব দিকটায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গা ঢাকা দিল ওরা। জনমানবশূন্য ময়দানে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল একা সুবীর।

বিকেলে বল খেলতে এল ওখানে কোন্ পাড়ার ছেলেরা কে জানে। তারা তাদের খেলার জায়গায় মড়াটাকে পড়ে থাকতে দিতে একদম নারাজ। সকলে মিলে মড়াটাকে ময়দান থেকে বিদায় করবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। সুবীরের দেহে ছেঁড়া চট জড়িয়ে ঘাড়ে করে তুলে নিল দুটি ছেলে। তারপর ছেলের দল সেই মড়া ঘিরে স্টেশনের দিকে চলল। পিছনের গেট দিয়ে লুকিয়ে স্টেশনের ভিতরে ঢুকে, যে ট্রেনটা সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল, তার একটা কামরায় বেঞ্চির তলায় সুবীরকে ঠেলে দিয়ে নেমে পড়ল ওরা।

সুবীর মরেনি তখনো। ছেঁড়া চটের ফাঁক দিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে। সব বুঝতে পারছে, সব জানতে পারছে। ছেলেদের শলা-পরামর্শ, তাকে নিয়ে কৌতুক করাকরি, সমস্ত শুনেছে স্বকর্ণে। ট্রেনে রেখে আসার জন্য ছেলেদের মধ্যে কার কত হিম্মত নিয়ে বাজি ফেলাফেলির কথাও শুনেছে।

বলতেও বিস্ময়, ভাবতেও বিস্ময়। ট্রেনের শেষ গন্তব্যস্থল অবধি দীর্ঘ পথ একই ভাবে পড়ে রইল সুবীর। কিন্তু কারো কোন লক্ষ্যই পড়ল না তার দিকটায়। ট্রেনটার যাত্রাপথ শেষ হল বোম্বে এসে। যাত্রীরা নেমে গেল পরপর। সব কামরাই ফাঁকা। ঝাড়ুদাররা অন্য কামরার মতো সুবীরের কামরায় এসেও হাজির হল। সাফ করবে। বেঞ্চির তলা পরিষ্কার করতে গিয়ে একজন অন্য জনকে আনন্দে জড়িয়ে ধরে 'মিলা' বলে চিৎকার করে উঠল।

ওরা ভেবেছিল বুঝি ওদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। চটে মোড়া জিনিস-পত্তর আছে। ওদেরই প্রাপ্য এসব। কিন্তু চট খুলতেই বুঝতে পারল বিধি বাম ওদের ওপর। মুরদা দেখে আঁতকে উঠল দু'জনে। দু'জনের মধ্যে বুড়ো ঝাড়ুদার সুবীরকে মিটমিট করে চাইতে দেখে, পালাতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এরপর বোম্বের হাসপাতালে সুবীরকে ওরাই ভর্তি করে দেয়। আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠল সুবীর সেখানে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার আগেই সুবীর মনস্থির করে ফেলল—দেশে ফিরবে না জীবনে। বাঙলার কোনখানেও না। তাই খুব শিক্ষা হয়েছে।

আপন-পর সকলকেই চিনেছে ভালো করে।

প্রেতাত্মার মর্মব্যথা শুনতে শুনতে ব্যথাকাতর হয়ে উঠেছি আমি। সুবীরের অতীত দুরবস্থার দৃশ্য যথার্থ প্রত্যক্ষ করছি যেন। শুধু প্রত্যক্ষই নয়, তখনকার পরিস্থিতি-পরিবেশের সঙ্গে মিলেমিশে চলেছি আমিও।

প্রেতাত্মা বলছে, হাসপাতালে থাকতেই দিনমজুর মতিলালের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সুবীরের। বেরুবার পর রুটির যোগাড করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে ওকে। কথা রেখেও ছিল মতিলাল। বোম্বেতে কোন কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারেনি বটে, তবে তার জানা শোনা লোকের সঙ্গে কাড়িপাণিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল!

পাহাড আর শালগাছ ঘেরা কাড়িপাণি। কাড়িপাণির কোন কোন পাহাড়ের স্তরে স্তরে লুকিয়ে রয়েছে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড। সাহেবদের নির্দেশে মজুররা পাহাড় কেটে পাথরের চাঁই বার করে। চাঁইয়ের বুক পিষে থেঁতলেই বাইরে বার করে নিয়ে আসা হয় শেষে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড।

কাড়িপাণির পাহাড় কাটা মজুরের কাজ পেল সুবীর মতিলালের বন্ধুর সহযোগিতায়। বেশীদিন টিকে থাকতে পারেনি একাজে। অমানুষিক খাটুনি। অনভ্যস্ত হাতে শাবল-গাঁইতি চালিয়ে পাথর কাটতে কাটতে অবশ হয়ে আসত হাত দুটো। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠত। টলে উঠত দু'পা। মনে হত, পাশের লোকটার শাবলের মুখে ওর দেহটা লুটিয়ে পড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে বুঝি এখুনি।

সহকর্মীদের অনেকের সহানুভূতি ছিল যে তার ওপর যথেষ্ট—একথা স্বীকার না করলে, মস্ত বড় অন্যায় করা হবে। সুবীরের শোচনীয় অবস্থা বুঝতে পারা মাত্র, ওরা তাকে ধরে বসিয়ে দিত। তার কাজ ওরাই করে দিত খানিক সময়। এতে ঈর্ষার আগুনে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেত অন্যান্য সহকর্মীরা। সুবীরের মতো রূপ নেই তাদের। নেই অপরকে বশীভূত করে, নিজের কাজ করিয়ে নিয়ে আরামে বসে বসে মৌজ করা আর মুফতে মজুরির টাকা লোটা। এরকম লোককে কি কেউ বরদাস্ত করতে পারে—না পারা উচিত? মোটেই নয়। পাহাড়ের তলায় ফেলে বুকে পাথর চেপে ধরে হাড় পাঁজরাগুলো গুঁড়িয়ে গুঁড়ো করে দিলে, তবে তাদের বুকের জ্বলুনি ঠাণ্ডা হবে। একথা দিনের ভিতর চার-পাঁচ বার করে শুনতে হয়েছে সুবীরকে ঠকঠক করে পাথর কাটা আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে।

আমার চোখের সামনে যেন সুবীরের অপঘাত মৃত্যুকে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে

দেখছি। সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর ঘাড়ের ওপর।

আমার মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে এক হিমপ্রবাহ বয়ে গেল যেন। তার জীবিতকালের ভয়াবহ শেষ নিদারুণ কথা শোনাবে এবার প্রেতাত্মা। তটস্থ হয়ে বসে আছি আমি। সুবীরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছিনে, অথচ চোখ নামাতেও পারছিনে। মনে ভীষণ ভয় চেপে রয়েছে। শুধু ভয় আর ভয়। কি জানি সুবীরের এমন সুন্দর মুখখানা হয়তো নিমেষে কেমন হয়ে যাবে। বীভৎস— অকল্পনীয় বীভৎস।

হাসছে প্রেতাত্মা।—সুবীর কাড়িপাণি ডুংগার অর্থাৎ কাড়িপাণি পাহাড় ছেড়ে যাবেই বা কোথায়? শত্রু বাড়ে বাড়ুক। মরতে হয় মরবে এখানে, বাঁচতে হয় বাঁচবে এখানে।

এই সর্বনেশে জিদের শেকলে বাঁধা পড়ল সুবীর। আটকে পড়ল কাড়িপাণির পাহাড়-ভূমিতে। প্রতিদিন কাজ সেরে, ক্লান্ত দেহে ফিরে যেত মজুরদের সঙ্গে ওদের লতাপাতায় তৈরী ঝুপড়িতে। এই ঝুপড়ি থেকে আসা-যাওয়া পথের দু'সারি শালগাছের পিছনে পিছনে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একদিন কয়েকটি যমদূত। বাগে পেলে, আটকে ফেলবে সুবীরকে। যে কোন মানুষ—যত শক্তিই ধরুক না কেন সে, বেরুতে পারে না ওদের কবল থেকে। সে তুলনায় সুবীর তো শিশু।

এই যমদূতের মতো মানুষদের কাছে সুবীর সন্দেহভাজন ব্যক্তি। নিশ্চয় জাসুস—পুলিশের টিকটিকি। তাদের চুরি-ডাকাতির গন্ধে এসে হাজির হয়েছে এই দুর্গম জায়গায়। মজুর সেজে খুঁজে বার করতে এসেছে তাদের লুকনোর গুপ্তস্থান। লোকটার হাবভাবে চেহারায় মনে হয় তাই। তারা যখন ডেরায় ফেরে, লোকটা তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে যেন কি দেখে। চাউনিটাও বিশেষ সুবিধের বলে মনে হয় না।

সত্যিই সুবীর লোকগুলোকে দেখত। একটা নতুন জায়গায় এসেছে, স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার বাসনা যে তার মনে জাগেনি, তা নয়। জেগেছিল। ওদের সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে হত রোজ। ওদের ধারণা ভুল। সুবীর কোন সময়ের জন্য সন্দেহের চোখে দেখত না, জানত না ওরা ডাকাত। ভেবেছিল স্থানীয় লোক। সুবীর খারাপকে ভেবেছে ভালো আর ডাকাতরা ভালোকে ভেবেছে খারাপ।

এই ভুল ভাবার দরুণই ওরা সুবীরের জীবন সংশয় করে তুলতে চেয়েছিল। সুবীরকে চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে ধরেছিল ওরা। কোন পালাবার পথ দেখতে পায়নি সুবীর কোনদিক দিয়েই। একসঙ্গে অনেকগুলো বলিষ্ঠ

কালো হাতের বর্শা-তলোয়ার উঁচিয়ে রয়েছে তার চোখের ওপর মুখের ওপর বুকের ওপর। মুখ বন্ধ চোখ বন্ধ প্রাণ যাবার লক্ষণ।

ওদের বৃত্তের বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে নিয়ে যেতে লাগল ওরা কোথায় কে জানে। অসহায়-নিরুপায় সুবীর মৃত্যুর পথ থেকে ফিরে এসেও আবার মৃত্যুগহ্বরের দিকেই এগুচ্ছে অনিচ্ছা সত্ত্বেও। স্বাভাবিক মৃত্যু থেকে বেঁচে গেছিল বোধ হয় নৃশংসভাবে মরবে বলে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে মারবে এরা। এদের বদ্ধমূল ধারণা—সুবীরই এদের পথের বিষাক্ত কাঁটা। নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে একে কালবিলম্ব না করে।

সুবীরের কাছে তার প্রতিটি পদক্ষেপ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। ভয়ঙ্কর থেকে আরো ভয়ঙ্কর। আরো আরো আরো—

সুবীরকে নিয়ে এসে যে জায়গায় থামল দুর্বৃত্তরা—সেখানে দিনের বেলাও রাতের অন্ধকার। ওপরের দিকটায় পাহাড়ে পাহাড়ে ঠেকাঠেকি। সূর্যের আলো প্রবেশ করে না জায়গাটায়।

সুবীরের অর্ধমৃতের মত অবস্থা।

দুর্বৃত্তদের কেউ কেউ এই ধূর্ত জাসুসকে উচিত মতো শিক্ষা দেবার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। তলোয়ারের এক কোপে ধড় থেকে ছিন্ন করে মাথাটাকে নামিয়ে দিতে চাইল কেউ। কেউ চাইল বর্শার খোঁচায় হৃৎপিণ্ডটাকে ক্ষত বিক্ষত করে তার উষ্ণ রক্তে স্নান করতে। আবার কেউ চাইল চোখ দুটো প্রথমে উপড়ে নিয়ে দগ্ধে দগ্ধে মারতে।

কারো কোন মতলবই কার্যকরী হল না শেষ পর্যন্ত ওদের মধ্যেকার সর্দার-গোছের লোকটার নির্দেশে।

লোকটার বজ্রগম্ভীর স্বরে পাহাড়ভূমি কেঁপে উঠল।…জিওতো দাটি দইস।…জ্যান্ত কবর দাও লোকটাকে!

কথাটার অর্থ বোঝেনি সুবীর। ভেবেছিল, তাকে মুক্তি দিতে বলছে বুঝি। কিন্তু পরে মানুষ-প্রমাণ মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করতে দেখে, লোকটার কথার মর্ম বুঝতে কোন অসুবিধে হয়নি তার।

হঠাৎ কি হল কিছু বুঝে উঠতে পারল না সুবীর। একবার গর্তের দিকে আর একবার তার দিকে ঘন ঘন চাইছে সকলে। সুবীরের মনে হচ্ছে, তাকে মাটির তলায় চাপা দেওয়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। দমবন্ধ হয়ে মারা গেছে সে মাটি-পাথর চাপা দেবার পর। সে এ দুনিয়ায় দাঁড়িয়েও অন্য দুনিয়ার। তার প্রেতাত্মা দেখছে ওদের। দেখছে গর্তটাকে।

গর্তের ভিতর একটা কঙ্কাল। বিস্ফারিত চোখে দেখছে ওরা কঙ্কালটার

মাথার খুলির কাছে দুটো পেতলের হাঁড়ি ভর্তি সোনার কত কি রয়েছে!

মুখ তুলে সুবীরের দিকে তাকাতেই ওরা তার মধ্যে হঠাৎ কি দেখল কে জানে। মনে হল যেন ভূতই দেখল সবাই। সভয়ে সমস্বরে আর্তনাদ করে উঠল ওরা।

সুবীরের দু'পাশে দু'হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল দু'জন। ওরা সঙ্গে সঙ্গে হাত ছেড়ে দিয়ে, উল্টোদিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল। অন্যেরা পড়িমরি করে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্যই যেন ছুটে পালাল।

সবাই চলে যেতে 'মরে গেছি' ভাবটা কেটে গেছে সুবীরের। সচেতন হয়ে উঠেছে। ফিরে যাচ্ছিল, কে যেন তার ভিতর থেকে নিতে বলল হাঁড়ি দুটো। কার জিনিস, কে রেখেছে, সোনাদানাগুলোই বা সৎ উপায়ের না অসৎ উপায়ের—নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব তোলপাড় করতে লাগল সুবীরের মনে।

কিন্তু সুবীর যতবারই ফেলবার জন্য পা বাড়িয়েছে, ততবারই ভিতরের অকাট্য যুক্তির কথা শুনেছে।—নাও। অন্যায় হবে না। এ নিয়ে ব্যবসা করলে অনেক—অনেক টাকা আসবে। এখন যা নেওয়া হয়েছে, তার দ্বিগুণ দিয়ে দিলেই তো হবে অনাথ-আতুরদের সেবায়।

ভিতরের কথা শুনে বড় ব্যবসাদার হয়েছে সুবীর আজ। সত্যিই অনেক টাকা উপায় করেছে। তাই আতুরদের সেবায় ভিতরের কথামতো কাজ করতে পেরে ঋণমুক্তও হয়েছে।

সব শুনে স্তম্ভিত আমি। সুবীর বেঁচে আছে। আসেনি সুবীরের প্রেতাত্মা আমার কাছে। এসেছে সুবীর স্বয়ং। এসেছে তার জীবনের আশ্চর্য রহস্য কাহিনী শোনাতে।

৮

ঘবটা যে কখন অন্ধকার হয়ে গেছে সে খেয়াল নেই হীরাবতীর। শুধু মনে আছে, জানলার ধারে এসে দাঁড়িয়েছিল সে। তখন সূর্যের এক টুকরো আলোও নেই আকাশে। অন্ধকার নামছে একটু একটু করে। ঘরে কেউ ছিল না। একলাই ছিল হীরাবতী। কেবলি তার মনে হচ্ছে, ঘুট ঘুটে অন্ধকাব তার চোখে ধুলো দিয়ে ঘরের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়েছে একেবারে হঠাৎই।

এই ঝাঁপানোটা বুঝতে পেরেছে ঘরের আলোটা তাড়াতাড়ি জ্বালতে গিয়ে বুকের আলো জ্বলে উঠতে দেখে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছে কিছুক্ষণ নিজের বুকের দিকে। পাথরটা জ্বলছে। ঠিক আগেরই মতো। দিনের বেলায় নিবে থাকে একদম। মন প্রাণ স্নিগ্ধ করা চাঁদের আলো রাতে যে কোথা থেকে পায় বুঝে উঠতে পারে না। এই বুকে প্রতিবাত জ্বলেছে এক সময়। জ্বলেছে সোনার সরু চেনটার লকেট হয়ে।

এখন ? এখন আলমারীর ড্রয়ারবন্দী। বছরের একটি দিন মাত্র মুক্তি পায় শুধু। কার্তিকী অমাবস্যার সন্ধ্যেয় ব্যতিক্রম হয়েছে এই প্রথম এবাবে। সন্ধ্যের একটু আগেই মুক্তি পেয়েছে। আগে মুক্তি দিয়ে ফেলল কেন—হীরাবতী নিজেও জানে না। প্রত্যেক কার্তিকী অমাবস্যায় সন্ধ্যে থেকে সারা রাত চেন হারটা হীরাবতীর গলায় জড়িয়ে থাকত আর লকেটটা বুকের মাঝখানে আটকে থাকত। হারটা দিয়েছিল জয়কান্ত। পাথরটার অন্য একটা ইতিহাস আছে। ইতিহাস আছে বলেই বুঝি সমস্ত রাত চোখে-পাতায় এক করত না একবারের জন্যও হীরাবতী। দেখত যেন কত কি এই পাথরটির মধ্যে দিয়ে। ভোরের আলো ঘরে পৌছবার আগে চোখে লাগবার আগেই তুলে রাখত আবার। পাথরটা তখনো জ্বলত—তোলবার সময়ে।

বুকের দিকে তাকিয়ে পাথরটায় ভিতর কি যেন দেখছিল, কি যেন দেখতে চেষ্টা করছিল। হঠাৎ চমকে উঠল কার জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ায়। ঘরের মধ্যে রয়েছে কেউ। তার আনমনার সুযোগ নিয়ে প্রবেশ করেছে কেউ। এতক্ষণ রুদ্ধনিশ্বাসে নিশ্চয় লক্ষ্য করছিল তাকে বেশ ভালো ভাবেই। নিশ্বাস বন্ধ করে রাখতে পারেনি আর। হয়তো নিজের আগোচরেই জোরে জোরে নিশ্বাস পড়তে সুরু করেছে ওর, নয়তো ইচ্ছে করেই ওর অস্তিত্ব জানাচ্ছে এই ভাবে।

বুকের ভিতর কেঁপে উঠল। লকেটটা কেউ ছিনিয়ে নিতে এসেছে নাকি ? হাত চাপা দিল লকেটের পপর। ঘরটা আরো জমাট অন্ধকার হয়ে উঠল। আলো জ্বালবার জন্য দ্রুত পায়ে সুইচবোর্ডের দিকে এগুল।…আলো জ্বলল। আলমারীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে বংশীমোহন। ওর দুচোখ জ্বলছে। বেশ জোরে স্পষ্ট করে বলল বংশীমোহন—পাথরটা ঢাকলে কেন ? হাত সরাও! সরাও বলছি !

কথায় আদেশের সুর। আদেশ অমান্য হলে যে একটা কাণ্ড হবে তা মুখচোখ দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরোচ্ছে, মুখখানা লাল হয়ে উঠছে। জিদ বাড়ছে, মাথায় উষ্ণ রক্ত বইতে শুরু করেছে।

লকেট থেকে হাত সরাল হীরাবতী। বংশীমোহনের দুচোখের শ্যেনদৃষ্টি পাথরটার ওপর। ও দুচোখ দিয়েই পাথরটাকে গিলে খেয়ে ফেলবে বুঝি এখুনি।

হারটা দাও আমাকে। দাও বলছি শীগ্‌গির।

ওর হাতে তুলে দিতে হবে রাত আলো করা পাথরটাকে। ভাবছে আর দেখছে, দেখছে আর ভাবছে হীরাবতী। এচোখ দেখেছে আগে, এ ধরণের কথা শুনেছে আগে।

জয়কান্তর চাউনিতে দেখেছিল এই চাউনি। জয়কান্তর মুখে শুনেছিল প্রায় এই রকমেরই কথা দেখা-বলার বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই দু'জনের মধ্যে। পার্থক্য আছে শুধু একটা বিষয়ের। সেটা পরিস্থিতির। তখন আর এখন—একেবারে বিপরীত পরিস্থিতি দুটো। তখন হারটা গলায় ঝোলে নি আর পাথরটা বুকের মাঝে জ্বলে নি। বলতে গেলে হারটা-পাথরটা ছিল না-ই তার কাছে। বলতে গেলে কেন—সত্যিই। কত বড় সত্যি এটা—সে সব জানত জয়কান্ত।

হারটা-পাথরটা কি-ভাবে চলে গেল তার কাছ থেকে—সেটা স্বচক্ষে দেখেছে। তবু পাগলের মতো ক্ষেপে উঠেছিল যেন মানুষটা। আশ্চর্য ! এর আগে জয়কান্তকে এরকম উত্তেজিত হতে দেখেনি কখনো হীরাবতী। রাগে অগ্নিশর্মা হতে দেখেছিল সেই প্রথম আর সেই শেষ।

সাত চড়ে মুখে রা বেরোয় না, মাটির মানুষ জয়কান্ত। সংসারে সবার কাছে আর বন্ধুমহলে এই খ্যাতির ভিত সুদৃঢ় ছিল তার। সে ভিতে ফাটল ধরল, ধসে পড়ল। চীৎকার করে বিকৃত স্বরে বলে উঠল—সরে যাও আমার সামনে থেকে এখুনি ! তোমার মুখ দেখতে চাই নে জীবনে আর ! কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যা কোনদিন করে নি, করতে সাহস করে নি—তাই করে বসল। সী-বীচে হীরাবতীকে একলা রেখেই হনহনিয়ে চলে গেল বাড়ীর দিকে।

জয়কান্তর মুখ থেকে এসব কথা শুনবে, এমন ব্যবহার পাবে বাস্তবিকই এটা

কল্পনাতীত ছিল হীরাবতীর কাছে। হীরাবতী স্তব্ধ বিস্ময়ে মানুষটার চলা পথের দিকে তাকিয়েছিল কেবল। ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারে নি। মুখে কথা সরে নি। হতবাক হয়ে গেছল একদম সে।

একলা ছেড়ে যেতে চাইত না মানুষটা। আশপাশের মানুষদের চলাফেরা তাকানো সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখত। বলত—এরকমও বেহায়া নির্লজ্জ হতে পারে লোক। এখানে এসে যে দুটো কথা কইব প্রাণখুলে দুজনে—সে উপায়ও নেই। কেবল ঘুর ঘুর করছে তোমার চারপাশে ওরা। আর তোমাকেই দেখছে শুধু। দেখে দেখে আশ আর মিটছে না কিছুতেই ওদের !

হীরাবতী নিরীহ জয়কান্তর সন্দেহ বাতিকে খোঁচা দিয়ে মজা পেতে ছাড়ত না। খিল খিল করে হেসে উঠে বলত—তা মিটবে আর কি করে বল। হীরাবতীর মতো ক'জনই বা রূপসী আছে পুরীতে ! তোমার অসহ্য হয়, যেতে পারো। বাড়ী তো বেশী দূর নয়। পরে যাব'খন।

এই যে রেখে যাচ্ছি—বলে, হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে যেত জয়কান্ত।

সেই মানুষই হীরাবতীকে একলা ফেলে চলে গেল আর বলে গেল, মুখ দেখতে চাই না…।

জয়কান্ত বলল যা, করলও তাই।

বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা দাপাদাপি করছে হীরাবতীর। চোখের কোণ টনটন করছে। এখনো চোখের সামনে ভেসে বেড়ায় অহর্নিশি দু'জনের সী-বীচে বেড়ানোর দৃশ্য।

জয়কান্তর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে বেড়াচ্ছে হীরাবতী সী-বীচে। মাঝে মাঝে জয়কান্তর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। ভিতরে হাহাকার করে উঠছে। সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার মতো তার আশা ভরসা ভবিষ্যৎ ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে। বেশ বুঝতে পারছে জয়কান্তকে ধরে রাখা যাবে না কোনো রকমে। রোগ ধরতে পারেন নি ডাক্তার বৈদ্যরা, দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে লোকটা। সমুদ্রের ধারে বেড়ানোই একমাত্র ওষুধ এখন। কিন্তু ও ওষুধও কোনো কাজ করছে না। করবেও না। এটা জানে হীরাবতী।

জয়কান্তর মন ভাঙছে দেহ ভাঙার চেয়ে বেশী করে। ডাক্তাররা নিজের ব্যাপারে সদা-সচেতন রুগীকে বাজে মিথ্যে বলে সান্ত্বনা দিতে ইতস্ততঃ করেছেন তাই। তবু ও ওর মনের জোর বজায় রাখতে, 'সমুদ্রের ধারে বেড়ালে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন' মনগড়া প্রবোধ বাক্য শুনিয়ে ছিলেন। এতে ফল হয়েছিল খানিকটা।

যে মানুষ শুয়ে পড়ছিল, সে উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে সুরু করলও ধীরে ধীরে। তারপর সী-বীচে নিয়ম করে আসাও হতে লাগল রোজ সন্ধ্যেয়।

এ সব সত্ত্বেও হীরাবতী কোনো বাঁচার লক্ষণই দেখতে পায় নি জয়কান্তর শরীরে। বরং মনে হয়েছে আগের চেয়ে আরো খারাপের দিকেই যাচ্ছে ও। আগে যা-ও বা একটু আধটু খেতে পারত, এখন সেটাও বন্ধ হয়ে আসছে।

বেড়াতে বেড়াতে জয়কান্ত জিজ্ঞেস করে—হীরা! এখন ভালো দেখছ না? এবারে বেঁচে উঠলুম তা হলে—

হীরাবতীর বুকের তলায় বোবা কান্না ডুকরে ওঠে। মুখ ফিরিয়ে ছোট্ট হুঁ বলে, একটু দূরে সরে যায় নিজেকে সামলে নিতে।

তেত্রিশ কোটি দেবতাকে মানত করেছে হীরাবতী স্বামীকে বাঁচাবার জন্য। সব নিস্ফল। দেবতারা বধির। নির্দয়। দেবতার ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে হীরাবতী। হারিয়েছে সবার ওপর। নিজের ওপরেও।

ম্লান মুখে হাসির মুখোশ পরে স্বামীর কথায় অনিচ্ছা সত্বেও সায় দিয়ে দিয়ে বেড়াত হীরাবতী।

জয়কান্তকে মিথ্যে আশ্বাস দেওয়ার ফল ভোগ করতে হত দারুণ ভাবে হীরাবতীকে। অনুশোচনার যন্ত্রণায় প্রতি রাতে বারান্দায় পায়চারি করে বেড়িয়েছে। হীরাবতীর অনুশোচনার যন্ত্রণা শেষ হল একদিন। হাসির মুখোশ খুলে পড়ল মুখ থেকে। মুখের মলিনতা মিলিয়ে গেল নিমেষে। প্রকৃত খুশির ঢল নামল!

কার্তিকী অমাবস্যা। সন্ধ্যে হয়েছে সবে। অন্ধকার অন্ধকার। সমুদ্রের ঢেউ আর সমুদ্র অন্ধকারে মিশে গেছে যেন। চোখে দেখা যাচ্ছে না কিছু। চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে যেন সমুদ্র ইচ্ছে করেই। হীরাবতীর প্রথমে মনে হয়েছিল, এই অলক্ষুণে অমাবস্যা আর সমুদ্র বুঝি তাদের দু'জনকে গ্রাস করবে বলে এই ষড়যন্ত্র করেছে। অদৃশ্যলোক থেকে ভীষণ গর্জন তুলে তুলে মৃত্যুত্রাস সৃষ্টি করছে স্রেফ। শূন্যে সাদা চকচকে চওড়া এক একটা বিরাট করাত দু-পাশ থেকে এগিয়ে এসে মিলছে। আবার ভেঙে দু'টুকরো হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। ওপাশ দিয়ে আবার একটা করাত আসছে। চলে যাচ্ছে। আবার —আবার আসছে।

অসহ্য হ'য়ে উঠছে এ দৃশ্য দেখা। হীরাবতী জানে, অন্ধকারে সমুদ্রে ঢেউ ভাঙার দৃশ্যটা এরকমই দেখায়। সব জেনেশুনেও ঢেউ ভাঙার ফেনাকে করাত ভাবছে তবু। ভয় ধরছে খুব। তন্ময় হয়ে দেখছে ওই ভয়ংকর দৃশ্য কেমন করে

জয়কান্ত। জয়কান্তকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে তাগাদা দিতে লাগল হীরাবতী।

ফিরে যেতে রাজী হল না জয়কান্ত। প্রকৃতির অপূর্ব বিচিত্র লীলা দেখছে সে। বড় ভালো লাগছে। সাদা ফেনাটা যেন সমুদ্র থেকে স্বতন্ত্র মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে সমুদ্র নেই। অথচ সমুদ্রের ঢেউ ভাঙা থেকেই ওর উৎপত্তি। এখানে মানুষের প্রাণের সঙ্গেই অন্ধকারের সমুদ্রের তুলনা চলে। প্রাণকে দেখতে পাওয়া যায় না। যায় দেহটাকে। দেহটা যেন সাদা ফেনা। মনের ভাব প্রকাশ করল হীরাবতীর কাছে জয়কান্ত।

জয়কান্তর এ দার্শনিক তত্ত্ব মেনে নিতে পারল না হীরাবতীর মন। নিজের অজান্তেই মৃত্যুকে যে ভালোবেসে ফেলে মৃত্যুর মোহ আকর্ষণে—তার কাছে এ ধরণের বক্তব্য ছাড়া আর কি-ই বা আশা করা যেতে পারে! বুকভাঙা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলল হীরাবতী। অশুভ আশঙ্কায় দুরু দুরু করছে ভিতরটা। সে তো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, অপ্রতিরোধ্য সর্বগ্রাসী কালের কালো অন্ধকার ঘিরে ধরেছে জয়কান্তকে। অনুনয় করে জয়কান্তকে ফিরে যেতে রাজী করাল। শরীরটা ভালো মনে হচ্ছে না হীরাবতীর। জয়কান্তর তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরাই ভালো আজ।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল জয়কান্ত। ফিরছে। হঠাৎ ডান পায়ে একটা পাথর এসে আছড়ে পড়তে চমকে ঘুরে দাঁড়াল। পায়ের কাছে পাথরটা জ্বলছে যেন। চাঁদের আলো ওর ভিতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে বুঝি। পাথরটাকে তুলে নিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। দেখছে হীরাবতীও। মাঝে মাঝে স্বামীর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। মৃত্যুর কালোছায়া ছোপ ধরাটা যেন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ক্রমে জয়কান্তর মুখ থেকে। আশ্চর্য! অদৃশ্য হয়ে গেল সম্পূর্ণ একেবারে।

এর পরের ঘটনা আরো আশ্চর্য। পাথরটা পাবার পর থেকে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল জয়কান্ত। একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মাল ওর—পাথরটাই তার নতুন জীবন দিয়েছে। পাথরটাকে চোখের আড়াল করতে চাইত না কোন সময়ের জন্য। হীরাবতীর চেন হারের লকেট করে দিয়েছিল। হীরাবতী চোখের সামনে থাকে সর্বক্ষণ। পাথরটাও চোখে চোখে থাকবে জয়কান্তর।

পাথর পেয়ে সমুদ্র বেড়ান বাড়ল আরও। হীরাবতীও আপত্তি করে না আর। সত্যি শরীর খারাপ থাকলেও না। নিজের দুর্বলতার দরুন নিজেই লজ্জিত। সমুদ্রের মধ্যে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখেছিল। মস্ত ভুল সেটা তার। এখন প্রতি সন্ধ্যেয় স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে এসে সমুদ্রের কাছে ক্ষমা চায় পূর্বের

ধারণার জন্য। ভাবে সমুদ্র থেকে অমৃতও যে ওঠে—এটা কেন আসেনি তার মাথার মধ্যে আগে। সমুদ্র থেকে যে বিষও উঠতে পারে—এটা ভাবেনি কেন আগে—এটাও ভাবতে হল একদিন হীরাবতীকে নতুন করে—মাস ছয়েক পরে।

স্বামী-স্ত্রী হাসিখুশিতে ডগমগ। সমুদ্র সৈকতের স্নিগ্ধতা লাগছে দুজনের চোখেমুখে। বালুভূমিতে পায়ের পাতা ডুবিয়ে হাঁটছে ওরা। ঢেউ-এর শেষ ছোঁয়া লাগছে ওদের পায়ে। আকাশ-সমুদ্র এক হয়ে যাচ্ছে ওদের চোখে। সন্ধ্যে নামছে সমুদ্রের বুকে। নামল। আচমকা কি যে হয়ে গেল—কিছু বুঝে উঠতে পারল না ওরা। একটা দমকা বাতাস এসে আছড়ে পড়ল ওদের দুজনের ওপর। ওরা ছিটকে পড়ল দুজনে দুধারে। অশান্ত সমুদ্রের-অশান্ত ঢেউ ওদের আপাদ-মস্তক ভিজিয়ে দিয়ে গেল।

নিজেদের সামলে নিয়ে উঠে একজন আর একজনের কাছে এসে দাঁড়াল যখন, জয়কান্ত হীরাবতীর কাছে এলো যখন, তখন একটা অন্তর্ভেদী আর্তনাদ করে উঠল হীরাবতীর বুকের দিকে তাকিয়ে। আর হীরাবতীও স্বামীর গলায় গলা মিলিয়ে সমস্বরে করুণ আর্তনাদ করে উঠল নিজের গলায় হাত বুলিয়ে। হার নেই পাথর নেই।

অনেকদিন অনেক করে হীরাবতীকে বলেছিল জয়কান্ত—দেখ! পাথরটা যেন হারায় না কখনো! হারালে আমায় পাবে না আর। আমিও শেষ। অতি যত্নে রাখত তাই গলার হারটাকে হীরাবতী। কিন্তু একি হল? অতর্কিতে সমুদ্র এ চাতুরী খেলল কেন তার সঙ্গে? পূর্বের ভয়ঙ্কর ভাবার প্রতিশোধ নিল কি?

স্বামীর মুখখানা দেখছে আর দু'চোখে জল ভরে উঠছে হীরাবতীর। পাথর খোয়া যেতে সঙ্গে সঙ্গে মানুষটাও কেমন হয়ে যাচ্ছে যেন। মুখের ভাবটা বদলাচ্ছে। রুগ্ন অবস্থার আদলে ফিরে আসছে। ফিরে এলো।

হীরাবতীর বুকের তলায় হিমশীতল ঠাণ্ডা রক্তের স্রোত জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। জয়কান্তকে বাঁচাতে পারা যাবে না হয়তো এবারে আর। মনটা ভেঙে পড়েছে বড্ড।

সর্বনেশে সমুদ্র বিষের জলে ডুবিয়ে সর্বহারা করতে বসেছে তাকে। সমুদ্র থেকে যে বিষও উঠতে পারে এটা ভাবেনি কেন আগে। কেন সমুদ্রের সামনে থেকে জয়কান্তকে আড়াল করে রাখে নি, সরিয়ে রাখেনি। ঝরঝর করে ঝরে পড়েছিল দু'চোখের জল হীরাবতীর।

স্ত্রীর কান্না দেখে ক্ষেপে উঠেছিল জয়কান্ত। হার ফেরৎ চেয়েছিল। তার

মুখ দেখবে না বলে স্থানত্যাগ করেছিল তখুনি।

নুলিয়াদের দিয়ে সমুদ্র তোলপাড় করিয়েছে হীরাবতী। হার খুঁজে পাওয়া যায়নি, পাথরও মেলেনি। ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে হীরাবতীকে নুলিয়ারা বুঝিয়েসুঝিয়ে। সমুদ্রের ওপর পুরো বিশ্বাস রাখতে বলেছে ওরা হীরাবতীকে। পুরীর সমুদ্র কখনো কারো কিছু আত্মসাৎ করেনি আজ পর্যন্ত। ফিরেয়ে দিয়েছে সবার সব কিছু। হারানো জিনিস পাওয়া গেছে এদিকে না হয় অন্য দিকে।

দু'দিন ধরে খোঁজা-খুঁজি চলেও এদিক ওদিকে—কোনদিক থেকেই হারপাথর পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে পড়ল হীরাবতী। এদিকে জয়কান্তও তার জিদ ছাড়ছে না কিছুতেই। সে মুখ দেখবে না বলেছে। হীরাবতীই তার মৃত্যুর কারণ। তার নিয়তি। তাহলে পাথর—যেখানে তার জীবন বাঁধা—সে বিষয়ে অত সাবধান করা সত্ত্বেও এমন বেহুঁশ যে ঢেউ-এর ধাক্কায় হার বেরিয়ে গেল গলা থেকে। নিশ্চয় হার কেটে আসছিল, লক্ষ্য ছিল না কোন। বিশ্বাসঘাতিনীর হাতে ভুল করে পাথর সঁপে দিয়ে নিজের অজান্তেই ডেকে এনেছিল সে তখন মৃত্যুকে।

মুখ বুজে সয়েছে হীরাবতী স্বামীর ভৎর্সনা। মানুষটা বলে কয়ে যদি বাঁচে বাঁচুক। একটুও অযত্ন করেনি হারটাকে-পাথরটাকে। ভালো করে লক্ষ্য রাখত রোজ। চেনে ক্ষয় ধরেনি। কাটবার মতো অবস্থাও হয়নি। কিন্তু এ নিয়ে বোঝালে বুঝবে না। উত্তেজনা বাড়বে বই কমবে না। তা ছাড়া বলবেই বা কাকে, বোঝাবেই বা কাকে। মানুষটার দুদিনের হাল দেখেই, বিপদ যে ঘনিয়ে আসছে—বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না একটুও।

মানুষটা যে ছ'মাস ভালো ছিল সেই ছ'মাস অসুস্থ থাকলে যে হারে শরীর ভাঙত, মুখচোখের চেহারা হতো—দু'দিনে তাই হয়েছে ওর অসম্ভবভাবে। পাথরের সঙ্গে কি এমন জীবনের যোগসূত্র থাকতে পারে তা চিন্তা করেও কোন হদিস বার করতে পারে না হীরাবতী।

অবিশ্বাসও করতে পারে না ঘটনাকে। যা ঘটেছে, যা ঘটতে যাচ্ছে তার প্রত্যক্ষদর্শী সে। মরণ পথের যাত্রীকে পাথরটাই বাঁচবার আশা জাগিয়ে তুলেছিল প্রবল। সুস্থও হয়ে উঠেছিল। আবার পাথরটার অবর্তমানে মানুষটা ছ'মাস পরেও পূর্বের অবস্থা ফিরে পেয়েছে। মৃত্যুর দিন গুণে চলেছে। সবই অদ্ভুত লাগছে হীরাবতীর কাছে। আরও অদ্ভুত লাগছে পাথরটাকে পাওয়া যাচ্ছে না দু'দিন ধরে—পাওয়া উচিত ছিল যেখানে।

দুদিনের দিন পাওয়া যায় নি বটে কিন্তু হারানোর চতুর্থ দিনের দিনে পাওয়া

গেছল। এবারে পায়নি জয়কান্ত। পেয়েছিল হীরাবতী।

তিন দিনের দিন শেষ রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল জয়কান্ত। মৃত্যু পর্যন্ত স্ত্রীর দিকে তাকায় নি। কাছে এলে খোলা চোখ বুজেছে। স্বামীর মৃত্যুতে হীরাবতী অনুশোচনার আগুনে জ্বলেছে। হারটা খুলে রেখে গেলে এ মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটত না হয়ত। অনুশোচনার জ্বালা একদিন মাত্র ভোগ ক'রে আর সহ্য করতে চায় নি সে। মরে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিল। তাই জয়কান্তর মৃত্যুর পরের দিনের শেষ রাতে চুপি চুপি বেরিয়ে গেছল বাড়ীর বাইরে। সমুদ্র ফেরত দেয় না কিছু। লোকে মিথ্যে রটায়। পাথর ফেরত দেয়নি। তাকেও ফিরিয়ে দেবে না এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। এখানে তার অশা পূরণ হবে। তার যে মুখ স্বামী দেখেনি—অন্য কেউও দেখতে পাবে না সে মুখ আর।

..সমুদ্রের সামনে এগিয়ে আসছে। যেখানে বসত দু'জনে, বেড়াত দু'জনে যেদিকে-সেখানে—সেখাখানে এসে দাঁড়াল একটু পরে। এগিয়ে যাচ্ছে আবার সামনের দিকে। হঠাৎ হারশুদ্ধ পাথরটা এসে আছড়ে পড়ল হীরাবতীর পায়ের কাছে ঢেউয়ের জলের জলে। জ্বলে উঠল পাথরটা। উপুড় হয়ে পড়তে পড়তে টাল সামলে নিয়ে হারটা তুলে নিল হীরাবতী। মুগ্ধচোখে দেখল খানিক একদৃষ্টে। তারপর অজান্তেই নিজের গলায় গলিয়ে দিল চেন হারটা। মনে হল, বেঁচে আছে জয়কান্ত। যে জন্য যা করবার জন্য এসেছিল হীরাবতী—সে পথ থেকে সরে গেল। আত্মঘাতী হতে ভুলে গেল একদম। আশ্চর্য! একবারের জন্যও মনে হল না তার—হারটা আগে পেলে জয়কান্ত বাঁচতে পারত।

বাড়ী ফিরে গেল হীরাবতী।

বছরের পর বছর ঘুরেছে। এই করে কেটেছে পাঁচটি বছর। এর মধ্যে একদিনের জন্যও স্বামীহারা মনে হয়নি হীরাবতীর। সময় সময় ভেবেছে, মাথাটা কি তার খারাপ হ'য়েছে? তা না হলে এরকম অবস্তাব কথা মাথার ভিতর জেঁকে বসে থাকতে পারে কেমন করে!

তখুনি অজ্ঞাতসারে চলে গেছে আলমারীর কাছে। ড্রয়ারটা খুলতেই পাথরটা নজরে পড়েছে। বাস্তব-অবাস্তবের কথা মাথা থেকে চলে গেছে তখুনি। কেবলি ভাবতে ইচ্ছে করেছে, বেঁচে আছে জয়কান্ত। পরম তৃপ্তিতে ভরে গেছে মনপ্রাণ ভাবার সঙ্গে সঙ্গে।

গলায় আর হারটা পরে না হীরাবতী রোজ। ড্রয়ার খুলে সকাল সন্ধ্যেয় দেখে কেবল। পরে মাত্র বছরের একটা দিন। কার্তিকী অমাবস্যার সন্ধ্যেয়।

এই দিনে এই সময়ে প্রথম পেয়েছিল। পাথরটার সঙ্গে নতুন জীবনও পেয়েছিল। প্রতি বছর একটা রাত প্রাণভরে পাথরের আলোয় নিজেকে ডুবিয়ে দেয় হীরাবতী। ওই আলোর ভিতর যেন জয়কান্তকেও দেখে সে চোখের সাধ মনের সাধ মিটিয়ে।

জয়কান্ত পাথর পেয়ে যেমন নতুন জীবন পেয়েছিল, তেমনি হীরাবতীর পাথর পাবার বছরখানেক পর ভাশুরের ঘরে একটি নতুন জীবন এসেছিল।

এই নতুন জীবন এল ভাশুরের প্রৌঢ় বয়সে। ঘর আলো করা প্রথম ছেলে। বংশীমোহন। বছর চারেকে পড়েছে বংশীমোহন। মায়ের কাছে থাকতে চায় না। চায় কাকীর কাছে সব সময়েই থাকতে। ছ'মাস বয়েস থেকেই এই রকমের ও। মাসখানেক মামার বাড়ী গিয়ে রোগা হয়ে এসেছে। খেত না, ঘুমুত না। বাড়ীর সকলকে জ্বালিয়ে মারত কাকীর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

ফিরে এসেছে কার্তিকী অমাবস্যার সন্ধ্যেয়। ঘরে এসেছে কখন জানে না। এ দিনে এ ঘরে এ সময় কেউ আসে না। বংশী আসতে চাইলেও, কান্নাকাটি করে রসাতল-তলাতল করলেও ওকে জোর করে আটকে রাখা হয়। আর তাছাড়া হীরাবতী এ দিনটায় সন্ধ্যে থেকে দরজা বন্ধ রাখে। শেষ রাতে হার তুলে রেখে তবে খোলে। হার পরা অবস্থায় বেরোয় নি কারো সামনে। দেখেনি এ হার কেউ।

দেখল বংশীমোহন। দরজা দিতে কেন ভুল করেছিল হীরাবতী তা নিজেও জানে না। অবাক হয়ে যাচ্ছে বংশীমোহনের হার চাওয়ার ধরনে। অবাক হয়ে যাচ্ছে ওর চাউনি। হার-পাথর খোয়া যাবার পর এই ভাবের কথা শুনেছিল, এই ভাবের তাকানো দেখেছিল জয়কান্তর।

এগিয়ে আসছে ছেলেটা। হীরাবতী দেখছে বাচ্চা নয় ও। বড়—অনেক বড়। কি বিচ্ছিরি চেহারা! জরাজীর্ণ রোগা-লিকলিকে! বুকের ভিতর একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা তোলপাড় করছে হীরাবতীর।

না দিলে, মুখ দেখব না তোর আর।

বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে পড়ল যেন হীরাবতী। কেঁপে উঠল ভিতর-বার। একি শুনল সে। স্পষ্ট বড় মানুষের কথা একেবারে। প্রথম থেকেই বাচ্চার আধো আধো কথা শুনতে পাচ্ছে না মোটে।

পিছু ফিরল বংশীমোহন। দ্রুত পায়ে দরজার দিকে যাচ্ছে। বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে।

কান্নাভেজা কাঁপা গলায় বলে উঠল হীরাবতী—যেও না। তোমার পাথর তোমার ফিরিয়ে দিচ্ছি আমি এখুনি। কথাগুলো যে কি করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—তা-ও জানতে পারে নি হীরাবতী।

ফিরে এলো বংশীমোহন হীরাবতীর কাছে। সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে মিটিমিটি। হারটা খুলে হাতে দিল হীরাবতী।

হাতে নিয়ে দেখছে বংশীমোহন পাথরটাকে। জ্বলছে পাথরটা। আনন্দে জ্বল জ্বল করে উঠছে দু'চোখ ওর। পরিবর্তন হচ্ছে মুখের রুগ্ন ভাবের। পরিবর্তন হচ্ছে লিকলিকে শরীরের।

হারটা ফিরিয়ে দিল হীরাবতীর হাতে বংশীমোহন। গম্ভীর ভাবে বলল, পাথরটা হারায় না যেন, সাবধানে রেখো।

হারটা হাতে নিয়ে দেখাতে দেখাতে পাথরটার গোপন রহস্য কাহিনী জানিয়েছিল আমায় হীরাবতী নিজেই।

৯

মুরলীধর পাঁচ মাথা তালগাছটার তলা দিয়ে আসছে পাথরখনির দিকে। লাল লাল শক্ত মাটির ডেলাগুলো জুতোর ডগায় ঠোক্কর খেয়ে ঠিকরে পড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে। পাহাড়ী নদীটার কাঠের পুলের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। বিছানো এক একটা কাঠ থেকে অন্যটা অনেক তফাতে। চলার একটু উনিশ-বিশ হলে, বেতালে পা পড়লে, ফাঁক দিয়ে গলে একেবারে নদীর বুকে পড়তে হবে।

দেখল খানিক নীচের দিকে তাকিয়ে মুরলীধর। কাকচোখ জল বয়ে চলেছে ঝিরঝির করে। পড়লে ডুববে না তবে খণ্ড খণ্ড পাথরের ঘায়ে দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে, আর হাড় ক'খানাও যে গুঁড়ো হয়ে যাবে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। আর তাছাড়া এত উঁচু থেকে নীচে পড়ে গেলে, অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকেও রেহাই পাবে না সে কিছুতেই।

এই পুল দিয়েই প্রতিদিন পেরোয়, এরকম চিন্তা-ভাবনা আসেনি মাথায় কোনসময়। কিন্তু আজ আসছে। কেন আসছে, কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। একটু ভেবে স্থির করল, দোনামনা ভাব নিয়ে পুলে ওঠা যুক্তিযুক্ত নয়। ঘোরাপথ দিয়ে যাবার মনস্থ করল। দেরী হবে না হয় একটু।

রাস্তায় ভয় ধরেছে দারুণ। চলতে চলতে কেবলই মনে হয়েছে, কতকগুলো লোকের নিঃশ্বাস তার গায়ে পড়ছে, অথচ তার আসে-পাশে নেই কেউ। দূরে দূরে মানুষ যেতে দেখেছে, তবুও ভয় কাটেনি তার।

মনে ভয় পুষে আর বিকেলের পড়ন্ত রোদ মাথায় করে পাথরখনিতে এসে পৌঁছল মুরলীধর।

তখন ব্লাস্টিংয়ের অর্থাৎ পাহাড় ফাটানোর তোড়জোড় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পাহাড়ের বুকে গর্ত করে করে বারুদ ঠাসা হয়ে গেছে, গর্তের মুখ থেকে বার করা নারকোল দড়িটা খানিক দূর অবধি টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওর শেষ প্রান্তে আগুন ধরাবার জন্য নিকষ কালো এক মজবুত দেহের মানুষ মোমবাতি জ্বেলে অপেক্ষা করছে। ঘন্টাধ্বনি করে লোকদের সরে যাবার নির্দেশ দেওয়া হবে এবার। মাটির তলায় চারতলা সমান পাথরখনির নীচের তলা থেকে

কুলিকামিনরা উঠে আসবে ওপরে—ওপর থেকে পাহাড় কেটে যে রাস্তা করা হয়েছে নীচ অবধি—সেই রাস্তা ধরে।

যতখানি পর্যন্ত পাহাড় ফাটাবে, পাথরের টুকরো ছিটকাবে তীরবেগে —ততখানি জায়গা লাল নিশান পুঁতে পুঁতে বিপজ্জনক এলাকার চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। তার বাইরে চওড়া চার দেয়ালের ওপর কুশঘাসের ছাউনি দেওয়া মাটির কুঁড়েঘরখানার দাওয়ায় এসে দাঁড়াল মুরলীধর। পাহাড় ফাটানো দেখবে। ফাটানোর সময় প্রায়ই দেখে সে। খানির মালিক সে-ই।

কিন্তু বুকটা দুরদুর করছে তার মৃত্যু ত্রাসে। এখানকার লোকজন, যাদের আপনজন ভাবত, তাদের দুশমন ভাবছে। এদের ভিতরের অনেকেরই জোড়া জোড় চোখ মুরলীধরকে কড়া নজরবন্দী করে রেখেছে যেন। ওরা যেন তাকে মেরে ফেলার একটা ফন্দী এঁটেছে। পাহাড় ফাটার সঙ্গে সঙ্গে শেষ করে ফেলবে। আশেপাশে কেউ নেই সত্যি, তবুও মনে হচ্ছে ক'টা লোক ঘোরাফেরা করছে চতুর্দিকে। এরা খুব চেনা চেনা। কে এরা বুঝতে পারছে না কিন্তু।

মনের কথা মুখ ফুটে বলতে পারছে না কাউকে। সাহায্যের জন্য, এরকম পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করার জন্য সাহস করে ডাকতে পারছে না কাউকে। সে যে ভীরু নয় সাহসী—জানে সবাই। দেশ বিভাগের পর চলে এসেছে এখানে। সিন্ধু থেকে পাকুড়ে। জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে দু'পায়ে দাঁড়িয়েছে। দুঃখ-কষ্টে ভেঙে পড়েনি কখনো, শোকে তাপে মুষড়ে পড়েনি। সকলে জানে, মুরলীধর সিন্ধী অতি সাহসী।

নিজের কাছে নিজেরই লজ্জা আসছে মুরলীধরের। লজ্জা এলেও নিস্তার নেই। সাহসের স্মৃতি টেনে এনে, সামনে তুলে ধরেও সাহস ফিরে পাচ্ছে না। মৃত্যুভয় হটাতে পারছে না। মনটা যেন আরো ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে। মেরুদণ্ডের ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত একটা কন্‌কনে ঠাণ্ডা স্রোত বইছে। স্নায়ুগুলো শিথিল হয়ে আসছে।

ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছে মুরলীধর। চরম মুহূর্ত আসছে বুঝি, এল বুঝি। বাতাসে শত্রুরা হয়তো কিছু বিষাক্ত বস্তু মিশিয়ে দিয়েছে। বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। মুরলীধরের দম নিতে কষ্ট হচ্ছে।

ঘণ্টাধ্বনি থামল। হুইশল বেজে উঠল। তীব্র আওয়াজটা কানের পরদা ছিঁড়েখুড়ে দিল যেন। আগুন জ্বলল বারুদের দড়িতে। দড়ি ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে আগুন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বারুদঠাসা এক একটা গর্তের ওপর। কয়েক মুহূর্ত নিশুতি রাতের নিস্তব্ধতা। তারপর আকাশ ফাটানো আর্তনাদ করে পাহাড় ফাটল। সঙ্গে সঙ্গে কুঁড়েঘরের দাওয়াটা ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠে ধসে পড়ল।

কোথায় ছিটকে পড়ল মুরলীধর বুঝতে পারল না। মুরলীধর বেঁচে আছে কি মরে গেছে তা-ও না।

এ-সব স্বপ্ন দেখেছে মুরলীধর।

মুরলীধরের গোঁ গোঁ আওয়াজে স্ত্রীর ঘুম ভেঙেছে। স্বামীকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তুলেছে। জেগেও কিছুক্ষণ সময় গেছে সামলাতে মুরলীধরের। স্বপ্নকে স্বপ্ন বলে মেনে নিতে মন চায়নি প্রথমে। নিজে বেঁচে আছে কি মরেছে, এ সন্দেহ কাটতে বেশ সময় লেগেছে।

অনেক দিন পরেও দুঃস্বপ্নের ছবি ভুলতে পারেনি এটা প্রমাণ হয়ে যেত মাঝে মাঝে। ব্লাস্টিংয়ের সময় এক একদিন হঠাৎ মনে হয়েছে, এইবার বুঝি ষড়যন্ত্রকারীরা তাকে দুনিয়া থেকে নিশ্চয় সরিয়ে ফেলবে।

এতখানি বলে একটু চুপ করে রইল পাথরখনির ম্যানেজার। চতুর্দিকে দু'চোখ চক্কর দিয়ে এল তার একবার। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে জানাল, ব্লাস্টিং হতে দেরী নেই আর।

কুঁড়েঘরের মাটির দাওয়ায় দু'খানা মুখোমুখি বেতের চেয়ারে আমরা বসে দুজনে। আমি আর ম্যানেজার। অন্য জগতে বিচরণ করতে করতে বলছিল সব ম্যানেজার। আমি শুনছিলুম।

আমাকে চমকে দিয়ে বলা শুরু করল ম্যানেজার আবার—

মুরলীধরকে দুঃস্বপ্ন থেকে থেকে বড্ড বেশী যন্ত্রণা দেয়—এটা ডাক্তার-বৈদ্য-মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের জানিয়ে ছিল সে। অনেক ওষুধ খেয়েছে ওঁদের, অনেক উপদেশও শুনেছে। ফল হয়নি। ফল হল, দুঃস্বপ্ন যখন সত্যি হল। অবিশ্যি সত্যি হল একটু অন্যভাবেই।

এই খনিতেই অন্যদের সঙ্গে কাজ করত দুজনে। একজন বড়কা সর্দার আর অন্যজন ঝুমনা মজুরনী। বড়কা পাথরের বড় চাঁই ভাঙত ভারী হাতুড়ির ঘা বসিয়ে বসিয়ে। ঝুমনা ছোট পাথর ভেঙে আরো ছোট ছোট করত। টুকরি ভর্তি করে মাথায় চাপিয়ে ওপরে নিয়ে আসত।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে দুজনের হাসিমস্করা চলত। ওরা নাকি একজন অন্যকে না দেখতে পেলে পাগল হয়ে ওঠে, অস্থির হয়ে ওঠে। কাজে মন টেকে না। ঘরে বাইরে স্বস্তি-সুখ পায় না।

এসব শুনে কোন্ স্বামীর না মেজাজ চড়ে, মাথায় রক্ত টগবগ করে ফুটে না ওঠে? ঝুমনার আদমীর মেজাজ চড়ল, খুন চাপল মাথায়। কিন্তু কিল খেয়ে কিল চুরিই করতে হল তাকে। বড়কা সর্দারের চেয়ে সে কমজোর তো বটেই,

তাছাড়া ওর তুলনায় লোকবলও অনেক কম তার। নেই বললেই চলে।

শেষ পর্যন্ত একটা মীমাংসা করে নিল আদমী বড়কার সঙ্গে। কিছু টাকা নিয়ে বৌকে ছেড়ে দিল। এটা সাঁওতাল সমাজের রীতির মধ্যেই পড়ে। দোষ দিল না কেউ আদমীর, দোষ দিল না বড়কার। বছর চারেকের ছেলে সোমের ভার কিন্তু নিল না কেউ। না নিল আদমী, যার নিজের ছেলে। না নিল সৎবাপ বড়কা। আদমীর ঠিক দোষ দিলে চলবে না। প্রথমে নিতে চেয়েছিল লোকটা। ছেলেটাই বাধ সাধল। মাকে জড়িয়ে ধরে কি চিৎকার, কি কান্না। যাবে না বাপের কাছে। আর সত্যি কথা বলতে কি, মায়েরও ছাড়বার ইচ্ছে ছিল না একদম।

ঝুমনার খুব আশা ছিল, অন্ততঃ তার মুখ চেয়ে বড়কা ছেলেটাকে ভালবাসবে, দেখবে। বড়কার দিন দিন আচার ব্যবহার দেখে ধারণা ধূলিসাৎ হয়ে গেছিল। বড়কার দু'চক্ষের বিষ ছেলেটা। বিয়ের পর থেকে বড়কা খালি বলতে শুরু করেছে, আপদটাকে এখান থেকে বিদায় করাই ভাল। ওর বাপ একটা আস্ত শয়তান। বড় হলে ছেলেটা কি আর না হবে বাপের মত। বিষবৃক্ষ চারা অবস্থায় মূল থেকে তুলে ফেলাই উচিত।

বড়কার দিকে খরখরে দু'চোখে তাকাত শুধু ঝুমনা। মুখে কিছু বলত না। মানুষটার চোখের দিকে চাইলে, একটা বিপদের আঁচ পেত যেন। বুক কেঁপে উঠত। কে জানে ছেলেটার না কোন অমঙ্গল করে বসে লোকটা।

যতটা পারল, বড়কার চোখের বাইরে সরিয়ে রাখতে লাগল সোমকে ঝুমনা।

এটা বুঝতে পারল বড়কা। রাগে আগুন হয়ে উঠল।

ছেলেটাকে নিয়েই ঝুমনা ব্যতিব্যস্ত দিনরাত। কাজে আসা ছেড়েছে, তার ঘরে যাওয়া ছেড়েছে। কোথায় থাকে কে জানে! ছেলেই ওর সর্বস্ব, বড়কা কেউ নয়। ছেলেটাকে সরাতে না পারলে ঝুমনাকে কাছে পাবে না বড়কা।

পাকুড়ের অন্ধিসন্ধি খুঁজে খুঁজে ঝুমনার মাসির কাছ থেকে ঝুমনাকে আর সোমকে বার করল বড়কা। ঝুমনাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কাজ করতে রাজী করাল আবার। সোম কত আদরের। ওকে সে-ই দেখবে। সোমকে না দেখতে পেয়ে মনঃকষ্টে দিন যাচ্ছে তার। সরল মনের মেয়ে ঝুমনা বড়কার কথা বিশ্বাস করল।

সেদিন একটু বাদেই ব্লাস্টিং হবে—এমন সময় সোম ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এই কুঁড়েঘরটার দিকে আসতে লাগল। বাচ্চাটার মুখে-চোখে দারুণ ভয়।

পিছু পিছু ছুটে আসছে বড়কা সর্দার আর জনাচারেক লোক। বাচ্চাটা যাতে কোন দিকে না গিয়ে এই দিকেই আসে—সেই ভাবেই ওরা তাড়িয়ে নিয়ে আসছে।

মুরলীধর বিপদমুক্ত এলাকায় নীল আকাশের নীচে চেয়ারে বসে বসে দুঃস্বপ্নের বাস্তবরূপ দেখছে যেন। তার মনে হচ্ছে, সে সোম। তাকেই মারবার জন্য ওরা দৌড়ে আসছে।

মুরলীধরের হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। দেহটাও। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। গলা শুকিয়ে কাঠ। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মৃত্যু বোধহয় এসে দাঁড়িয়ে আছে পিছনে।

ঘরের মধ্যে সোমকে জোর করে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল বড়কা। চোখ রাঙিয়ে চেরাগলায় শাসিয়ে দিল ওদের সাঁওতালী ভাষায়, বেরুবি না এক পা-ও। এখানে ওখানে ঘুরঘুর করলে, পাথর ফেটে ঠিকরে এসে মাথায় লাগলে বাঁচাতে হবে না আর।

মুরলীধরের ভিতর বলছে, বড়কা সর্বনেশে লোক। তলায় তলায় তাকে মেরে ফেলার বন্দোবস্ত করে বাঁচাবার চেষ্টা দেখাচ্ছে। তার নমুনা টের পাওয়া যাবে এখুনি।

মুরলীধর যেন জড়বস্তু হয়ে যাচ্ছে এবার। নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। দম আটকে আসছে তার।

ঘণ্টা বাজছে। যে যেদিকে পারল, ছুটে পালাল। সতর্কধ্বনি থামতেই বেজে উঠল হুইশল।···দড়াম দড়াম শব্দে পাহাড় ফাটল। সঙ্গে সঙ্গে কুঁড়েঘরটা ধসে পড়ল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে মুরলীধরের বুকের ওপর ছিটকে এসে পড়ল সোম। সচেতন হয়ে উঠল মুরলীধর। তার মনে হল, সে মরেছিল, প্রাণ ফিরে পেল যেন আবার। ভীতসন্ত্রস্ত সোমকে দু'হাতের বেষ্টনী দিয়ে চেপে ধরে রইল।

খানিক বাদে সোমকে যত্ন করে নিয়ে গেল মুরলীধর নিজের বাড়িতে।

পরে বিপদমুক্ত এলাকায় বিপদ ঘটার ইতিবৃত্ত জানতে পারা গেল অনুসন্ধান করে। বড়কাই সোমকে শেষ করার জন্য সব ব্যবস্থা করে রেখে দিয়েছিল। কুঁড়েঘরের বাইরে পিছনের গর্তটায় সবার অলক্ষ্যে প্রচুর বারুদ ঠেসে রেখেছিল। গর্তের মুখ থেকে ঘাসের তলা দিয়ে লম্বা দড়িটা নিয়ে গেছিল অনেক দূর অবধি। দড়ির শেষের দিকটায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল সে নিজেই।

···এবার ব্লাস্টিং হবে। নিরাপদ জায়গায় সরে গেল সকলে। নতুন কুঁড়েঘরটার দাওয়ায় আমরা। আমার ভয় ধরছে, এ ঘরটা না উড়ে যায় আবার

আমাদের নিয়ে। ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি একদৃষ্টে। মুখখানায় ভয়ডরের লেশমাত্র নেই ওর। চোখে চোখ পড়তে হাসির রেখা ফুটে উঠল ঠোঁটের ফাঁকে। অভয় দিল যেন আমায়।

আমি দেখছি ম্যানেজারকে। দেখতে চেষ্টা করছি শিশু সোম সাঁওতালকে মুরলীধরের স্নেহপুষ্ট তরুণ ম্যানেজার সোম সাহেবের মধ্যে।

১০

চারদেয়াল এগিয়ে আসছে ক্রমশ চারদিক থেকে। শুয়ে আছে বনমালা মাঝখানে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যাবে একদম আর একটু পরেই। বেশ বুঝতে পারছে, মৃত্যু শিয়রে উপস্থিত। এই ভাবেই তার মতো মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করে গেছে বোধহয় নবাবী আমলের এক একজন সুন্দরী। জীবন্ত সমাধি দেওয়া হত সেখানে চার দেয়াল গেঁথে। এখানে দেয়াল গাঁথা হয়নি, বনমালার নিজের ঘরেরই দেয়াল চেপে-পিষে মারবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে।

বুকের ওপর কোন একটা ভারী বস্তু চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তার। বস্তুটা কি বুঝে উঠতে পারছে না। তবে ভীষণ ভারী হয়ে উঠছে। হাড় পাঁজরাগুলো মটমট করে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে বুঝি এখুনি। অসহায় অবস্থা। সাহায্যের জন্য যে কাউকে ডাকবে সে ক্ষমতাও নেই। জিভটা টানছে ভিতর দিকে। গলা থেকে বুক অবধি শুকিয়ে কাঠ। চেষ্টা করেও মুখ দিয়ে একটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারছে না। বনমালা মনে মনে ডাকছে নাগরাজকে। তুমি এস ! [illegible] রাক্ষুসে দেয়াল চারটের মারাত্মক খপ্পর থেকে আমাকে উদ্ধার কর। আমাকে বাঁচাও। বুকের ওপর থেকে বোঝাটাকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে দাও এখুনি। সইতে পারছি নে আমি আর একতিলও।

কেউ এল না। নাগরাজ তো নয়ই। বনমালার মনের ডাক, আকুতি কারো কানে পৌঁছবার কথা নয়। পৌঁছয়নি। মনের কানেও পৌঁছতে পারেনি কারো। মাঝ রাতে ঘুমে অচেতন প্রায় সবার মন।

বুকের তলায় একটা অসহ্য-অজানা ব্যথার খোঁচায় বনমালার ঘুম ভেঙে গেছিল আচমকা। চোখ খুলে চতুর্দিকে তাকাতেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে সর্বশরীর শিউরে উঠল। দেখল, দেয়াল চারটে জীবন্ত হয়ে উঠেছে···চোখ চেয়ে থাকতে পারেনি বেশীক্ষণ। বুজে ফেলেছে।

উঠতে পারছে না। নড়তে পারছে না। সমস্ত দেহটা অবসন্ন-অবশ।

প্রাণের চেয়ে বড় আর কিছু নেই তুনিয়ায় ভিতরের বাঁচার তাগিদে অসাড় অঙ্গে সাড় এসে গেল যেন হঠাৎ। নেভবার আগে প্রদীপ জ্বলে উঠল যেন। নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে জোর করে তু'চোখ খুলতে চেষ্টা করল। পালাবার যদি কোন সুবিধে পায়, পালাবে। জানালা দরজা খুলতে পারলে, বাইরে লাফিয়ে পড়েও প্রাণ বাঁচাবে।

চোখ খুলে তাকাতেই ভয়ানক ভাবে একটা ধাক্কা খেল বনমালা। বুকের মাঝখানে পান্না বসানো লকেটটার ওপর একটা মুখ! স্পষ্ট দেখছে ডিমলাইটের ফিকে সবুজ আলোয়। মুখখানা অজানা কোন বৃদ্ধার। এরকম চামড়া কোঁচকানো মাকড়সার জাল আঁকা মুখ এর আগে কখনো কোথাও দেখেনি। বৃদ্ধার তীক্ষ্ণ স্থির দৃষ্টি আটকে পড়েছে তার মুখের ওপর। কোটরগত চোখের আগুনের হলকায় বনমালার সমস্ত মুখ ঝলসে যাচ্ছে। এভাবে ঝলসাতে থাকলে মুখ বিকৃত হয়ে যাবে। তু'চোখ অন্ধ হয়ে যাবে জন্মের মতো।

বনমালার চোখ মুখ গলা বুক জ্বলছে। ভীষণ জ্বলুনি। অসহ্য হয়ে উঠছে। তাকিয়ে থাকতে পারল না আর। আপনা হতেই তু'চোখের পাতা নেমে এল। বেঁহুশ হয়ে পড়ল বনমালা।

জ্ঞান যখন ফিরল, তখন সকাল হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পুবের জানালা দিয়ে আকাশের রোদ এসেছে ঘরে। প্রথম চোখ চাইতে আঁতকে উঠল বনমালা। নাগরাজের মুখে রাতে দেখা বৃদ্ধার মুখটাই দেখল যেন আবার দিনের আলোয়। অচৈতন্য হয়ে পড়ল এবারেও।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় নাগরাজ স্ত্রীকে নিয়ে মহা ফাঁপরে পড়ল। স্ত্রী তাকে দেখলেই চমকে উঠছে, চোখ বুজছে, জ্ঞান হারাচ্ছে।

এই অবস্থা চলল দিন তিনেক। ডাক্তার বৈদ্যের কোন ওষুধই কাজে লাগল না। কি রোগ ধরতে পারল না কেউ অনেক চিন্তা গবেষণা করেও।

রুগীর মুখ থেকেও কোন কথা শুনতে পেল না যাতে রোগের কারণ খুঁজে বার করা যায়।

বনমালার অবস্থা শোচনীয়। শুধু স্বামীর মুখ কেন, সম্বিৎ ফিরলে যে কোন লোকের মুখ চোখের সামনে পড়েছে, আত্মীয় স্বজন মায় ডাক্তার-বৈদ্যের মুখেও ওই ভয় ধরানো জ্ঞান হারানো একটা মুখই দেখছে কেবল। বৃদ্ধার—অন্য কারো নয়।

বৃদ্ধার মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুখ বন্ধ হয়েছে। যন্ত্রণার কথা বলতে

গিয়ে নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছে। কোথায় কোন্ অজ্ঞাত দেশের কোন্ গহন অন্ধকারে অতল তলে তলিয়ে গেছে নিমেষে।

বরাবরের সুস্থ নীরোগ বনমালার ক্ষণে ক্ষণে অজ্ঞান হয়ে পড়া ব্যামোর কথা চতুর্দিকে আপনজনদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সকলেই দেখতে এল। বাড়ি ভর্তি লোকে লোক। রোগ সম্বন্ধে হিতাকাঙ্ক্ষীদের ধারণা এক এক জনের এক এক রকম। নিরাময় করে তোলবার উপদেশও ভিন্ন ভিন্ন। পরস্পরে মতপার্থক্যও যথেষ্ট।

তবুও অন্ধকারে আলোর দিশারা ভেবে নিয়েছে নাগরাজ প্রত্যেকের মতকে। সাধ্যমত তাদের কথা রাখতে চেষ্টা করেছে। উপকার হয়নি কিছু বনমালার। সুস্থ হয়ে ওঠেনি।

সুস্থ হয়ে উঠল তিনদিন পরে। হঠাৎ যেমন বনমালা দেখতে শুরু করেছিল বৃদ্ধার মুখ, তেমনি হঠাৎই চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছিল একেবারে সে-মুখ আশ্চর্য ভাবে। বনমালা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল আগের মতো।

স্বাভাবিক হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অন্য বিপদ এসে উপস্থিত হল আবার বাড়িতে। বনমালার ছোট বোন যেন কেমন হয়ে যেতে লাগল থেকে থেকে। ভালো করে নজর করতে দেখা গেল, বনমালার মতোই ও চোখ চাইতে পারছে না। বেহুঁশ হয়ে থাকছে বেশীর ভাগ সময়।

নতুন রোগটা সংক্রামক মনে হল বাড়ি সুদ্ধ সকলের। অনেকেই ভাবল বনমালার মতো আপনা হতেই সেরে যাবে হয়তো তিন দিন পরে। কিন্তু তিন দিন ছেড়ে চার দিন পাঁচ দিন হয়ে গেল, তবু একটুও সুরাহা হল না ছোট বোনের। বরং আরো বাড়ের মুখে এগুতে লাগল।

ছ'দিনের দিন না জেনেই যে কাজ করে ফেলেছিল বনমালা, তাতেই ভালো হয়ে উঠেছিল ছোট বোন।

অবাক লেগেছিল বনমালার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা। তার অজ্ঞান অবস্থায় হারিয়ে যাবার ভয়ে সবুজ হীরে বসানো লকেটের হারটা গলা থেকে খুলে নিয়েছিল বোন। পরেছিল নিজের গলায়। বনমালাও বোনের অচৈতন্য ভাব দেখে দেখে তার সখের দামী হারটা চুরি যেতে পারে ভেবেছিল। খুলে নিয়েছিল হারটা তাই। খোলার কিছুক্ষণ পরই অভাবনীয় ঘটনা ঘটতে দেখেছিল। বোনের অসুস্থতা কোথায় যেন চলে গেছিল মুহূর্তে।

সকলেই নতুন রোগের উৎপত্তি-উপশমের রহস্য জানতে পেরেছিল। হারটাই যত অনাসৃষ্টির মূল। পরলে ভয়াবহ মৃত্যুযন্ত্রণা, খুললে স্বর্গের শান্তি।

হার রহস্যের দুটো দিক মেনে নিতে পারল না আবার কেউ কেউ। সন্দিগ্ধ মনের লোকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। এদের দলে নাগরাজও যোগ দিয়েছিল।

মেয়ে-পুরুষ পালা করে এক একজন হারটা গলায় দিয়েছিল। একদিনের বেশী দু'দিন রাখতে পারেনি কেউ কাছে। বনমালার মতোই দেখেছে প্রত্যেকে বৃদ্ধার শুকনো মুখ চোখের আগুন। দেখেছে জীবন্ত চারটে দেয়াল জানালা-দরজা সুদ্ধ এগিয়ে আসছে। অনুভব করেছে বুকের ওপর পাথর বোঝার অসহ্য যন্ত্রণা। শক্ত সমর্থদের বেহুঁশ হয়ে পড়তে দেরী লাগেনি বেশীক্ষণ।

একবাক্যে স্বীকার করেছে সবাই—এ সর্বনেশে হার ঘরে রাখা উচিত নয়, কাছেও রাখা উচিত নয়। এ হার কাছে থাকলে দুর্বল মানুষের জীবন সংশয় হয়ে যেতে পারে চোখের পলকে।

সখের হার ত্রাসের বাতাস ছড়াচ্ছে বাড়িময়। জহুরীকে ফিরিয়ে দিতে স্বামীর মতেই মত দিল তাড়াতাড়ি বনমালা।

স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে এল জহুরীর দোকানে।

হারটা ফেরৎ নিতে চাইল না জহুরী। পরিষ্কার জানিয়ে দিল, কেনার আগে বলে দেওয়া হয়েছে তো ফেরত নেওয়া হবে না আর। রাজী হয়েই তো মিস্টার-মিসেস নিয়েছেন।

হারের রহস্য শুনে মুখখানা খুব গম্ভীর হয়ে গেল জহুরীর। একটু চুপ করে থেকে সে বলল, এই একই কথা শুনে শুনে অনেকের কাছ থেকে ওই হার ফেরৎ নেওয়া হয়েছে। সেই জন্যই প্রথমে বলে দেওয়া হয়েছিল—এ হার কারো সয় না। তা সত্ত্বেও জোর করে কিনেছিলেন মিসেস। বলেছিলেন, সওয়া-না-সওয়া ক্রেতা বুঝবে। দোকানীর মাথাব্যথার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি ফেরৎ দিতে আসবেন না কোনদিন।

দোকানীর সব কথাই সত্যি। 'সয় না' কথার ভিতর যে এত রহস্য লুকানো আছে, তা কেমন করে জানবে বনমালা? হারের সবুজ পাথরটাকে খুব পছন্দ হয়েছিল বলেই লোভ সামলাতে পারেনি।

এখন মনে হচ্ছে, তখন যেন দোকানী আরো কিছু বলতে চেয়েছিল। উত্তেজিত হয়ে বনমালা বলতে দেয়নি। ভেবেছিল, তার পছন্দের সুযোগ নিতে চাইছে বুঝি দোকানী। আর তা ছাড়াও বাঙ্গালোরের নামী-দামী ঘরের বৌ জেনে, হারটার দাম বাড়াবার ফিকির আঁটছে ভয় ধরিয়ে।

সে ভুল ভাঙল, কিন্তু হারের কোন গতি করা গেল না। মহা সমস্যায় পড়ল

স্বামী-স্ত্রী। হার নিয়েই ম্লান মুখে বাড়ি ফিরতে হল ওদের দু'জনকে।

এরপর সাত দিন ধরে স্বামী-স্ত্রীতে চিন্তা করেছে অনবরত। কি ভাবে কার কাছে বিদায় করা যায় হারটাকে। পথ খুঁজে পায়নি। অজানা লোককে না জানিয়ে গছালে, শেষ পর্যন্ত কারো না কারো মৃত্যুর জন্য দায়ী হতে হবে তাদের। এ কাজ তাদের বিবেক বুদ্ধি থাকতে কিছুতেই করতে পারবে না। অথচ হারটাকে বেশীদিন সিন্দুকজাত করে রাখাও মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কে জানে, সিন্দুকের ভিতর থেকেও কখন কি মূর্তি ধরে বসে আবার।

চিন্তায় সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায়। চাপা স্মৃতির দরজা খুলে যায়। পথ খুঁজে পেল বনমালা। মনে পড়েছে নন্দীগ্রামের ভোগনন্দীশ্বর দেবতাকে। এ হার দেবতার গলায়ই দেওয়া ভালো। দেবতার ইষ্ট-অনিষ্টের বালাই নেই। অশুভ মৃত্যুরও আশঙ্কা নেই। মনের কথা স্বামীকে জানাল বনমালা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল স্বামী-স্ত্রী।

আটদিনের দিন ভোরে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে নন্দীগ্রামে এল বনমালা। হারের সঙ্গে পুজোর ডালা ধরে দিল পুরোহিতের হাতে। সবুজ হীরের হার উঠল ভোগ নন্দীশ্বরের গলায়।

নিশ্চন্ত হয়ে ঘরে ফিরল স্বামী-স্ত্রা দু'জনে।

নির্বিঘ্ন-নিশ্চিন্তে দেবতার পুজো-পাঠ করে আসছেন এতদিন ধরে ভোগনন্দীশ্বরের পুরোহিত ঠাকুর। পুজো-পাঠে বাধা পড়তে শুরু হল এবার। সন্ধ্যে-আরতির পর ধ্যানের সময় লক্ষ্য করলেন তিনি দেবতার বুকের সবুজ হীরেটায় একটা বৃদ্ধার মুখ ফুটে উঠছে ধীরে ধীরে। মুখখানা স্পষ্ট হয়ে উঠল। চোখ বোজা অবস্থায় এ দৃশ্য দেখলেন তিনি। তাকালেন। মনের চোখে দেখাটা বাইরের চোখ আরো পরিষ্কার দেখলেন। হতভম্ব হয়ে গেলেন।

ষাটের কোঠায় পড়েছেন তিনি। ধ্যানের সময় বাধা—ওরকম একটা নতুন-বিস্ময় উপস্থিত হয়নি কোনদিন তাঁর মনের চোখে, বাইরের চোখে। মনের ভুল কি চোখের ভুল—বার বার চোখ বুজে আর তাকিয়ে ঠিক করতে চেষ্টা করলেন। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল—কোন দেখাই তাঁর ভুল নয় ভিতরের বাইরের —দুটোই নির্ভুল।

একটা বিস্ময়ের ধাক্কার রেশ থাকতে থাকতে আর একটা এসে হাজির হল। কারণ চোখে দেখছে বৃদ্ধা পুরোহিতকে। পুরোহিতও তার দৃষ্টির আওতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন না। বৃদ্ধার মুখখানা খুব চেনা চেনা মনে হতে

লাগল। স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়ে হাতড়ে দশ বছর আগের একটা ছবি খুঁজে পেলেন পুরোহিত।

উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর অঞ্চল থেকে স্বামী-পুত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছিল একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক একদিন। মন্দিরের সুন্দর কারুকার্য দেখে পুরোহিতের সঙ্গে বসে বসে এক একদিন অনেক কিছুই আলোচনা করেছে। কবে তৈরী হয়েছে, কারা করেছে ইত্যাদি। পুরোহিত যেটুকু জানেন, জানিয়েছেন। একসঙ্গে এতগুলো মন্দির তৈরী দীর্ঘ ইতিহাস। চোল-রাজাদের আমলে শুরু, বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সময় শেষ।

স্ত্রীলোকটি যে ক'দিন ছিল, আরতি দেখত প্রতিদিন। ধ্যানের সময় তন্ময় হয়ে যেত মূর্তির সামনে বসে। পুরোহিতকে ভক্তিশ্রদ্ধা করত খুব। দেশে ফিরে যাবার সময় পুরোহিতের খাতায় নাম-ঠিকানা লিখিয়ে দিয়ে গেছিল। অনুরোধ করেছিল, ওদিকে গেলে যেন তাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে না ভোলেন পুরোহিত মশাই।

সেদিনকার প্রৌঢ়া আজ বৃদ্ধা। কিন্তু চোখের ভাব সেই রকমই। কেবল চামড়া কোঁচকানো ছাড়া মুখের আদল বদলায়নি বিশেষ। বেশ মনে পড়ছে, এই রকমই হার যেন তার গলায় দেখেছিলেন পুরোহিত মশাই। দেখেছিলেন এই সবুজ হীরের লকেট।

ঘটনাটা বলতে বলতে থেমে গেল ত্রিবেণীশঙ্কর। ঘরের চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। জোরে নিঃশ্বাস ফেলল একটা। ছেলের নিঃশ্বাসের সঙ্গে কমলা দেবীরও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ঝরে পড়ল। আমি রুদ্ধনিঃশ্বাসে বসে আছি। পরের ঘটনা শোনার প্রতীক্ষা।

দু'চোখ জলে ভরে উঠল, তবু ভেজা গলায়ই বলতে শুরু করল আবার ত্রিবেণীশঙ্কর। তখন আমার কতই বা বয়েস—বছর দশেক। ওই বয়েসে যা দেখলুম চোখের সামনে—এই বাইশ বছর বয়েসেও মনে পড়লে বুকের তলার রক্ত হিম হয়ে আসে। সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

বাবা মা সে রাতে বাড়ি ছিলেন না। দিদিমার অসুখ দেখতে গেছিলেন বেনারসে। বাড়িতে ঠাকুমা আর আমি। ঠাকুমারও ক'দিন ধরে শরীর ভালো যাচ্ছিল না মোটে। ঘুষ ঘুষে জ্বর হচ্ছিল রোজ সন্ধ্যেয়। সন্ধ্যে থেকেই বিছানা নিতেন উনি। আমি পড়াশোনা সেরে রাত আটটা-নটা নাগাদ ওঁর কাছে শুতুম। সে রাতেও শুয়েছিলুম।

মাঝরাতে খুটখুট-খস্‌খস্ আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। ঠাকুমার দিকে

তাকাতেই, মুখে আঙুল দিয়ে ইশারায় চুপ করে থাকতে বললেন। ঘরের পূর্ব কোণে কাঠের পিলসুজের ওপর পিতলের প্রদীপটা জ্বলছিল তখন। ও কোণটায় একটা জলচৌকির ওপর একটা বিষ্ণুর ছবি আছে! সন্ধ্যে হবার মুখে ধূপ-প্রদীপ জ্বেলে দেন নিজেই ঠাকুমা।

প্রদীপের আলোয়ই দেখছি আমি। ঝড় নেই বৃষ্টি নেই, অথচ দরজাটা থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। বাইরের থেকে কেউ খোলবার চেষ্টা করছে। হাতুড়ি-বাটালি দিয়ে দরজায় ঘা মেরে মেরে, দরজার কোন্ জায়গাটা যেন কাটছে। একটু পরেই ভিতরের ছিট্‌কিনি আটকাবার জায়গা থেকে একটা কাঠের টুকরো ঠক করে খসে পড়ে গেল মেঝেয়। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে আঙুল গলিয়ে কে একজন ছিটকিনি খুলে ফেলল। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে আমার ভয়ে। জড়িয়ে ধরলুম ঠাকুমাকে। ঠাকুমা ধীর-স্থির নির্বাক। দেখছেন আমাকে। দেখছেন, দেখছেন। কালো পোশাকে আপাদমস্তক ঢেকে যে এক দঙ্গল লোক হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল, তাদের দিকে কোন লক্ষ্যই নেই ওঁর।

লোকগুলো প্রত্যেকে চকচকে ছোরা উঁচিয়ে আমাদের চারপাশ ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়াল, ওদের মধ্যে থেকে একজন ঠাকুমার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে তীব্র-কর্কশ স্বরে বলল, হারটা নিজে হাতে খুলে না দিলে, তোকে আর তোর নাতিকে শেষ করে দেব এখুনি।

ঠাকুমা নিরুত্তর। লোকটার কথায় কর্ণপাত করলেন না। আমায় আর একটু চেপে ধরলেন বুকের কাছে।

এরপর চলল ওদের তাণ্ডব। ঠাকুমার বুক থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিলে ওরা আমায়। দেয়ালে ঠেসে চেপে ধরেছে দু'জনে। আমি ঠাকুমার কাছে যাবার জন্য ধস্তাধস্তি করছি দু'জনের সঙ্গে। সেই মুহূর্তে ভয়-ডর চলে গেছিল একেবারে আমার মন থেকে।

ঠাকুমার অবস্থা দেখছি। উনি উঠে বসেছেন। সরোষে বলছেন, ইয়ে হার নহী দুঙ্গী, নহী দুঙ্গী···। আমি কিছুতেই দেব না হার, কিছুতেই না।

যত ঠাকুমার কাছে যাবার জন্য ছটফট করছি, হাত-পা ছুঁড়ছি চিৎকার করছি, তত দু'জনে আরো জোর করে ধরে রাখছে আমায়। একসঙ্গে অতগুলো লোক আর ঠাকুমা একা। অসুস্থ-দুর্বল ঠাকুমা দু'হাত দিয়ে প্রাণপণে বুকে চেপে রেখেছেন সবুজ হীরের লকেটটা।

শেষ অবধি হারটা রাখতে পারেননি ঠাকুমা। বাঁচাতে পারেননি

লকেটটাকে। হারটা নেবার পর নিস্তব্ধ নিঝুম রাতে বুক কাঁপানো অট্টহাসি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছিল সকালে।

হার চলে যাবার পর থেকে ঠাকুমা প্রাণে বেঁচেও মরে রইলেন যেন। মুখে অহর্নিশি হার আর হার। রাতে ঘুমুতেন না। ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতেন। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে বলতেন,…বহুরাণী, ইয়ে হার রাজলছমী…। শাশুড়ী বলে গেছিলেন, বৌ! এ হার রাজলক্ষ্মী…।

হারটার এক বিচিত্র. ইতিহাস শুনেছি ঠাকুমার মুখে। এ বংশে ক'পুরুষ থেকে হারটা বড় বৌয়েদেরই গলায় উঠে আসছে পর পর। শাশুড়ীরা মারা যাবার সময় নিজে হাতে গলা থেকে খুলে বড়বৌকে পরিয়ে দিয়ে গেছেন এক একজন। যিনি পরাবার সময় পাননি, চলে গেছেন হঠাৎ—তাঁর হয়ে কুলগুরু মৃতের গলা থেকে ওই হার খুলে রীতি অনুযায়ী বড় বৌয়ের গলায় পরিয়ে দিয়েছেন। ঠাকুমাকেও তাঁর শাশুড়ী পরিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এ হার বংশের প্রথম গরীব পুরুষকে বহু ঐশ্বর্য দিয়েছিল। এর দৌলতেই এখনো সব…রাজলক্ষ্মী।

ঠাকুমা আপসোস করতেন, কোন বড় বৌ খোয়ায়নি এ হার। বংশের নিয়ম রক্ষে করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। কিন্তু তাঁর জীবনে এ কি হল! বংশের রীতি ভঙ্গ! সর্বনাশ করে গেলেন তিনি বংশের!

কখনো কখনো আমাকে ডেকে বলতেন, খুঁজে দেখ দিকিনি হারটা! নিশ্চয় পাবি। কোথাও না কোথাও পড়ে রয়েছে নিশ্চয়। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি সবুজ হীরে জ্বল জ্বল করছে আমার চোখের সামনে যেন।

কথা শুনে সকলেই ভাবল সত্যি ওঁর মাথাটা বিগড়েছে। হারটা ওঁর মনে সংস্কারের শক্ত পাঁচিল হয়ে খাড়া ছিল। সেই হার হারিয়ে যাওয়াতে সেটা ভেঙে গেছে। সে ব্যথা সামলে উঠতে আর পারলেন না উনি।

হার চলে যাবার বছর খানেকের মধ্যে ঠাকুমার মরমর অসুখ হল বার তিনেক। ডাক্তার কবিরাজরা জবাব দিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি মরলেন না। যেন পুনর্জীবন পেয়ে বেঁচে উঠতে লাগলেন! কাছে পেলেই বলতেন, দাদুভাই! হারটা খোঁজো! তোমার মাকে না পরিয়ে যেতে পারছি নে আমি!

আশ্চর্যভাবে হারটা নিজেই বাড়ি খুঁজে এল যেন একদিন। তখনো ঠাকুমা শয্যাশায়ী। হারটাকে নিয়ে এলেন ভোগনন্দীশ্বর মন্দিরের পুরোহিত। তিনি ঠাকুমার চোখের ডাকে থাকতে পারেননি। লকেটের ওপর ঠাকুমার ভেসে ওঠা মুখখানা এই বাড়ির দিকেই ঠেলে দিত তাঁকে যেন বার বার। কেবলই মনে হত

ঠাকুমার দু'চোখ ডাকছে তাঁকে এই বাড়ি থেকেই বুঝি। হারটাকে নিয়ে আসতে বলছে তাঁকে তাড়াতাড়ি।

ঠাকুমার গলায় হার পরিয়ে দিলেন পুরোহিত। লকেটের সবুজ হীরের মতো ঠাকুমার দু'চোখও জ্বল জ্বল করে উঠল। চোখের ইশারায় মাকে ডেকে কাঁপা হাতে হারটা নিজের গলা থেকে খুলে মায়ের গলায় পরিয়ে দিলেন। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, বহুরাণী ইয়ে···রাজলছমী। কথা জড়িয়ে গেল ঠাকুমার। আস্তে আস্তে দু'চোখ বুজে এল।

১১

খানিক যেতে না যেতেই ব্রীজমোহন দাঁড়িয়ে পড়ল। পা দুটো আটকে গেছে মাটির সঙ্গে। একটা বিষম বিস্ময়ের ধাক্কা লেগেছে মনে-চোখে। চোখ-মন সজাগ করেও বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে পারছে না কিছুতেই। চোখকে অবিশ্বাস করেও বিশ্বাস করতে হচ্ছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে এক নারীমূর্তি। মূর্তি পাথর লোহার নয়, মাটি-কাঠেরও নয়! একেবারে জলজ্যান্ত রক্ত মাংসের।

বিদ্যুতের চমকে দেখতে পাচ্ছে, মূর্তি নিশ্চল নয়। সচল, চলছে। পূর্ব দিকটাই লক্ষ্য যেন ওর। ওধারে ব্রীজমোহনও যাবে। যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল সে আজ দিন তিনেক ধরে। এখন যাচ্ছে। কিন্তু সামনে এই বিপত্তি।

গয়া শেরঘাটি রোড থেকে ভিতরের দিকে এ জায়গাটায় বড় একটা আসে না কেউ। দিনের বেলায়ই গা ছমছম করে এলে—রাতে তো দূরের কথা। রাত হলেও সন্ধ্যের মুখেতেই নিশুতি রাতের অন্ধকার নেমেছে জায়গাটায়। আকাশ ভরা কালো ঘন মেঘ আর মুষলধারে বৃষ্টি একটা ভয়াবহ সৃষ্টি করেছে। এ সময় এ দুর্যোগে এখানে কোন ছেলের আসাই অসম্ভব যখন, তখন কোন মেয়ের কথাই আসে না। আসে না বললে চলবে না এখন আর। এসেছে একটি স্ত্রীলোক।

বিদ্যুতের আলো অদৃশ্য হলে জমাট অন্ধকার সঙ্গে সঙ্গে ঢেকে ফেলেছে স্ত্রীলোকটিকে। হারিয়ে যাচ্ছে ও নিমেষে। আকাশ-মাটির বুকে বিদ্যুতের লুকোচুরি খেলায় স্ত্রীলোকটি দৃশ্য-অদৃশ্য হচ্ছে বার বার ব্রীজমোহনের চোখে। এ এক বিচিত্র ছবি দেখছে ব্রীজমোহন।

ব্রীজমোহন দেখছে আর ভাবছে। ভাবছে আর দেখছে।

তার কাছ থেকে স্ত্রীলোকটির দূরত্বের ব্যবধান বেড়ে উঠছে ক্রমশ। বেশ বোঝা যাচ্ছে ক্ষণিক আলোর পর জমাট অন্ধকার কোন প্রতিবন্ধক হয়নি ওর পথ চলার। বোধহয় চোখের প্রখর আলোর ফলকে অন্ধকারের বুক খুঁড়ে-ফুঁড়ে পথ করে নিয়ে এগিয়ে চলেছে ও ঠিকই।

যত দূর দৃষ্টি যায়—আলো-আঁধারিতে স্ত্রীলোকটিকে যতটুকু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—তাতে মনে হচ্ছে ও কোন ধনীর ঘরণী। চুমকি বসানো পাতলা ফিনফিনে গোলাপী ওড়নাটা মাথা থেকে বুক অবধি ঢাকা। বৃষ্টির জলে ভিজে সপসপে হয়ে গেছে। গায়ের সঙ্গে লেপটে রয়েছে। আকাশ থেকে আলোর রেখা ওই দেহে ছিটকে পড়লেই চুমকিগুলো ঝকমক করে উঠছে। যেন আসমান থেকে খসে পড়া একটা তারা ওর মাথায় পিঠে বুকে হাতে ফুটে উঠেছে। হাতের নাকের গলার গয়নাগুলো জ্বল জ্বল করে মাথা তুলেছে ওড়নার তলা থেকে।

স্ত্রীলোকটির কোন লক্ষ্যই নেই কে তাকে দেখছে না দেখছে। আপন মনেই চলেছে ও।

ব্রীজমোহনের আটকে পড়া দু-পা হঠাৎ আলগা হয়ে গেল যেন একটা অমোঘ আকর্ষণে! আকর্ষণটা আসছে স্ত্রীলোকটির দিক থেকেই। ওকে অনুসরণ করার দুরন্ত বাসনা জেগে উঠছে ভিতরে। পা বাড়াল ব্রীজমোহন, অনুসরণ করবে। যতই এগুচ্ছে ততই স্ত্রীলোকটি তার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল ব্রীজমোহন ওকে আটকাবার জন্য। সঙ্গে কেউ সঙ্গী নেই নিশ্চয়। থাকলে এতক্ষণ নজরে পড়ত। পথ হারিয়ে ফেলে হয়তো এসে পড়েছে এপথে। বেরুবার জন্য দ্রুত পায়ে চলছে তাই। জোরে পা চালিয়ে ধরে ফেলতে না পারলে মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে তার।

স্ত্রীলোকটিকে প্রথম নজরে পড়তে মনে হয়েছিল একটা বিপত্তি এসে খাড়া হল বুঝি এ সময় তার চলাচলের সামনে। সে ভুল ভেঙেছে এখন। ওর গা ভর্তি গয়না। অজস্র ধন্যবাদ ঈশ্বরকে। এ সুযোগ গ্রহণ না করলে দুঃখকষ্ট জীবনেও ঘুচবে না তার।

ভগবানের করুণা কত তার ওপর। তিন দিনের অভুক্ত আর্তের ডাক কানে পৌঁছেছে তাঁর। রাতারাতি আমীর বনে যাবে ব্রীজমোহন। ব্রীজমোহন নিজে আর স্ত্রীলোকটি ছাড়া এই পাণ্ডব বর্জিত নির্জন জায়গায় আর তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। এখানে ওর করুণ আর্তনাদে দৌড়ে সাহায্য করতে আসবে না ওকে কেউ। কার্যসিদ্ধি হবে তার অনায়াসে। উদ্ধত শাণিত ছোরার সামনে হৃৎকম্প হবে রমণীর। ত্রাসে বেহুঁশ হয়ে ঢলে পড়ার আগেই কোন ইতস্ততঃ না করে এক একখানি গয়না নিজের দেহ থেকে খুলে খুলে কাঁপা হাতে তুলে দেবে ব্রীজমোহনের বজ্রকঠিন হাতে।

চলছে তাড়াতাড়ি ব্রীজমোহন। স্ত্রীলোকটিও হনহনিয়ে চলছে। হনহনিয়ে চললেও কিছুতেই নিস্তার পাবে না ও ব্রীজমোহনের কাছ থেকে। আর কিছুক্ষণ

বাদেই চলা থেমে যাবে। ব্রীজমোহন কত শক্তি ধরে বুঝবে তখন। ছোরার বাঁটটা চেপে ধরল শক্ত মুঠোয়। হাসছে মনে মনে। পয়সা অলারই স্তুতি সর্বত্র। এবারে মামা-মামী বাড়ী থেকে দূর করে বার করে দেবে না আর তাকে। তাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে ঘরের দরজায় খিলতালা লাগাবে না আর, দাদা-বৌদিও।

বৌদির কথাগুলো এ সময়ে মাথার মধ্যে কিলবিল করে উঠছে কেন আচমকা! রোজই তো বল তুমি এবার রোজগার করে টাকা এনে দেবেই। মিথ্যে, সব মিথ্যে—

না, না, না। মিথ্যে নয়। স্বগতোক্তি করে ওঠে ব্রীজমোহন। ছোরা ধরা মুঠোটা শিথিল হয়ে আসে আপনা থেকেই। প্রাণপণে চেপে ধরে আবার গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে। এটাই শেষ সম্বল তার জীবিকা উপার্জনের, এটাই তাকে ফকির থেকে আমীর করে তুলতে পারে এক মুহূর্তে। কিন্তু—নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে ব্রীজমোহন। ভাগ্যদেবী বহু ছলনা করেছে তার সঙ্গে। তাকে অনেক রকমের মিথ্যে আশা দিয়ে নিরাশ করেছে স্রেফ। অতীতের সেই সব নির্মম খেলা নতুন করে কি খেলতে শুরু করেছে আবার ভাগ্যদেবী?

স্ত্রীলোকের গয়নার মোহজাল বিস্তার করে তাকে ডাকছে। রমণীটি কি আলেয়ার আলো না মরুভূমির মরীচিকা? কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। ভিতর থেকে ঠিক বেঠিক কোন উত্তর পাচ্ছে না। একটু আগের বড়লোক হবার আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হতে বসেছে। মাথাটা কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।

মাথা গুলোনো শুরু হয় তার দশ বছর বয়েসে প্রথম। মায়ের মৃত্যুর পর। উচ্ছৃঙ্খল পিতার হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন মা দিনের পর দিন। আহার জোটেনি অর্ধেক দিন। তাঁর নিজের না জুটলেও ব্রীজমোহনের জুটিয়েছেন তিনি। যত্ন-আত্তির কোন ত্রুটি হয়নি তার মা চলে যাবার আগে পর্যন্ত।

মা বেঁচে থাকতেই দাদা বৌদিকে নিয়ে বাড়ী ত্যাগ করে অন্য জায়গায় চলে গেছল মায়ের নির্যাতন সহ্য করতে পারেনি বলে।

মায়ের আত্মমর্যাদা বোধ ছিল খুব বেশী। অভাব-অনটনে বিপর্যস্ত হয়েও ডাকাডাকি সত্ত্বেও কোন আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে যাননি কোন দিন। কোন সাহায্যও চাননি কারো কাছ থেকে কখনো। ব্রীজমোহনকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে মানুষ করে তোলবার জন্য মামার অনুরোধ নাকচ করে দিয়েছেন মা অনেকবার।

মা যা নাকচ করেছিলেন, বাবা তা বহাল করলেন মায়ের মৃত্যুর পরই। অর্থাৎ মামার বাড়ী রেখে এলেন ব্রীজমোহনকে।

বছর আষ্টেক ছিল ব্রীজমোহন সেখানে। আট বছরে আট হাল হয়েছে তার। মামার অসাক্ষাতে মামীর দুর্দান্ত দাপট সময় সময় এত অসহ্য হয়ে উঠেছে তার যে, যেখানে দুচোখ যায়, চলে যেতে ইচ্ছে করেছে। মামা বাড়ী ফিরলে কেঁদে কেটে অনুযোগ করেও কোন ফল ফলেনি। মামীর রক্তচক্ষুর কাছে মামার ম্লান চোখ নত হয়েছে। নির্বাক মুখে সেখান থেকে সরে গেছে মামা তখুনি।

মামাতো ভায়েদের রাজার হালে থাকতে দেখেছে ব্রীজমোহন। দেখেছে তাদের বই বগলদাবা করে স্কুলে যেতে। দেখেছে বাড়ীতে এসে পড়াতেও মাস্টারকে। সমবয়সী ভায়েদের মত নিজেও হতে চেয়েছে। পারেনি। নিজের মনের কথা-ব্যথা জানিয়েও সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারেনি কারও। নিজের ওপর কারও করুণামমতা জাগিয়ে তুলতে পারেনি অন্যের অন্তরকে নাড়া দিয়েও।

বড় থেকে ছোট পর্যন্ত—সকলেই এক বাক্যে রায় দিয়েছে—তার নাকি মাথা মোটা ভয়ানক। শত চেষ্টা করলেও কস্মিনকালে কিছু হবে না। চাকরবৃত্তি করার জন্যই জন্ম তার। প্রকৃতি-বুদ্ধিতে পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে তাই। চাকরদের সঙ্গে শোওয়া-বসা নাওয়া-খাওয়ার অভ্যেস করতে করতে ওদের মত বাজার দোকান করাটাও মগজে যদি কিছু ঢোকে, তাহলে এখানে না থাকতে পারলেও ভবিষ্যৎ দিন গুজরানের ব্যবস্থা অন্য জায়গায় থেকে করতে পারবে তবু।

এরপর আর কথা চলে না। অনুরোধ-উপরোধও না। চাকরদের টালি-খোলার ছাদের ঘরে গিয়ে দড়ি ছেঁড়া খাটিয়ায় তেল চিটচিটে কাঁথার ওপর আছড়ে পড়েছে। হাপুসনয়নে কেঁদে কেঁদে বুক ভিজিয়েছে। মনে মনে মাকে ডেকেছে শুধু—তুমি এসো! যেখানে আছো, নিয়ে যাও আমায়! মাকে ডাকতে ডাকতে ঘুমিয়ে পড়েছে। স্বপ্নে দেখেছে মাকে শাড়ীর আঁচলে চোখ মুছিয়ে দিতে। মাথাটা বুকে চেপে ধরেছে। বুকের ধুক পুকুনি শুনেছে চাপা কানটায় স্পষ্ট। ঘুমের ঘোরে 'মা তুমি যেও না' বলে চীৎকার করে উঠেছে।

জেগে উঠে মাকে দেখতে না পেয়ে আরো কেঁদেছে। কেঁদে কেঁদে সারা হয়েছে সর্বক্ষণ। কাছে কেউ আসেনি সান্ত্বনা দিতে।

এই ভাবে বছরের পর বছর কাটতে লাগল ব্রীজমোহনের। শেষে মামীর ক্রোধ চরমে উঠল একদিন। লঘু পাপে গুরু দণ্ড হল তার। অপরাধ—জ্বরের জন্য মামাতো ভায়ের স্কুলে বই বয়ে নিয়ে যেতে নারাজ হয়েছিল সে সেদিন।

মামী হিংসুটে কুঁড়েপাথরকে বসিয়ে খাওয়াতে রাজী হল না একাতলাও। আশ্রয় দেওয়াও আর চলবে না তার পক্ষে একদম।

মুখ দিয়ে কথা খসবার সঙ্গে সঙ্গে কথা মাফিক কাজও করল মামী। গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে বার করে দিতে নির্দেশ করল চাকরদের! গলা ধাক্কা খাবার আগেই বাড়ী থেকে ম্রিয়মাণ মুখে বেরিয়ে গেছে ব্রীজমোহন।

...দাদার কাছে এসে উঠেছে। দাদা—এক মায়ের পেটের ভাই। দাদা কখনও এরকম করতে পারবে না তার সঙ্গে। আরও আগেই আসা উচিত ছিল। এলে এত হেনস্থা হতে হত না তাকে। দাদার আশ্রয় নিশ্চয় অনেক—অনেক নিরাপদ। বরাত সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।

দাদার বাড়ীতে দু'বছরে আরো দুরবস্থা হল ব্রীজমোহনের। মামীকে হার মানাল বৌদি। মামী তাকে গোলাম বানাতে চেয়েছিলেন, বৌদি তাকে গুণ্ডা বানাতে চাইলেন। শুধু গুণ্ডা বানাতে চাইলে তবু রক্ষে ছিল, কিন্তু তা নয়, খুনী ডাকাত তৈরী করতে চাইলেন।

অবিশ্যি বৌদির এটা অন্তরের কথা না ঘাড় থেকে বোঝা নামানোর জন্য মুখের কথা—বুঝতে পারেনি ব্রীজমোহন তখন।

ব্রীজমোহনকে সরোষে বলেছেন বৌদি—অপদার্থ কোথাকার! কাজ না পেলে—চুরি ডাকাতি করে উপায় করতে পারো তো! খুন-খারাপি করেও যে উপায় করে, তাকেও মানুষ বলা যায়। তুমি একটা আস্ত জন্তু। জন্তুকে পোষা হয়েছে অনেক দিন। আর একদণ্ডও না।

বৌদির কথাগুলো বর্শার ফলার মতো বিঁধেছে মাথার ভিতর। বিঁধেছে বুকের ভিতর। বোবা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েছে ব্রীজমোহন। দ্বিরুক্তি না করে স্থান ত্যাগ করেছে তখুনি। অনির্দিষ্ট পথে পা বাড়িয়েছে।

...হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছেছে শেরঘাটি রোডের ওদিকে কুখ্যাত অঞ্চলে। না জেনেই এসে পড়েছে সে। কতকগুলো তরুণকে একসঙ্গে বসে জটলা করতে দেখে এসেছে। যদি এদের কাছ থেকে কোনো কাজের সন্ধান পায়।

উপস্থিত হতেই, ওরা দাঁড়িয়ে উঠে, ছোরা উঁচিয়ে গোল হয়ে ঘিরে ধরেছে। সকলে সমস্বরে বলে উঠেছে—ক্যা হ্যায় নিকালো।

কাছে কিছু নেই—বিশ্বাস করেনি ওরা। একদম নগ্ন করেই দেখেছে তাকে —সত্যি বলেছে, না মিথ্যে বলেছে।

সমস্ত প্রমাণ নেবার পর, শুনেছে ওরা ব্রীজমোহনের মামীর কথা, বৌদির কথা। জেনেছে ব্রীজমোহনের মনোগত ইচ্ছে। সে মানুষ হতে চায়। চুরি-

ডাকাতি খুনখারাপি করেও। বৌদির মুখে প্রথম এসব কথা শুনে সে ব্যথা পেয়েছিল খুব। কিন্তু এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছে, তার ভৎ'সনা ব্রীজমোহনের বাঁচবার পক্ষে মহামূল্য উপদেশ। বৌদির কথাগুলোই মনে মনে জপ করছে সে।

দলের সর্দার আগন্তুক বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী—মনের এই সংশয় ঘোচাবার জন্য তার আপাদমস্তকে ভয় ধরানো তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরেছিল বার চারেক। তারপর মৃদু-হেসে হাত বাড়িয়ে, হাত চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়েছিল দুবার।

এরপর চুরিডাকাতি-খুন খারাপিতে হাত পাকাবার জন্য তালিম দিয়েছিল মাসছয়েক। মাস ছয়েক এমনি ছেড়ে রেখে পরীক্ষা করেছিল—ঠিক মতো শিকার ধরতে পারে কি না সে।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। দুর্বৃত্তপনায় পারঙ্গম হয়ে উঠেছে এত কম সময়ে দেখেই সর্দারের পুরনো চেলাচামুণ্ডাদের সর্বশরীর জ্বলে গেছে হিংসেয়। সর্দারের বেশী প্রিয় হয়ে ওঠবার আগেই তাকে দল থেকে সরাবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত তাদের ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে। দলের সকলেই একবাক্যে বলেছে সর্দারের কাছে—ব্রীজমোহন কোন কাজেরই নয়। উপায় করে তারা। ও বসে বসে তাদের বখরায় খায় শুধু। এতদিন সর্দারের কাছে ওর কাজের মিথ্যে প্রশংসা করেছে তারা ওর চেতনা আনবার জন্য—মানুষ যদি হয়ে উঠতে পারে এর মধ্যে। কিন্তু মানুষ ও হবে না। ওকে দলচ্যুত করাই যুক্তিসঙ্গত।

সবার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে সর্দার। ব্রীজমোহন দলচ্যুত হয়েছে। দলচ্যুত হবার দিনে সর্দারের কর্কশ কণ্ঠের শাসানি শুনেছে—দলের কথা কারো কাছে প্রকাশ হলে দুনিয়া থেকে সরে যেতে হবে তাকে।

দল থেকে সরে এসে পোড়োবাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে সে। তিন দিন উপোসী দলে ঢোকবার উপায় নেই আর। মামীর কাছে বৌদির কাছে ফেরারও উপায় নেই। কোন কাজই জানে না সে। সুতরাং কাজ পাবার কথাই ওঠে না। কাজ পাবে না—এ অভিজ্ঞতা অনেক আগে থেকেই হয়ে আছে তার।

সব দিক দিয়ে চিন্তা করে দেখেছে। বেঁচে থাকবার পথ খুঁজে পায়নি একটাও। পেয়েছে যেটা, সেটা আত্মরক্ষার নয়। আত্মঘাতীর।

আত্মঘাতী হতেই মনস্থ করেছে সে। তার জন্য কাঁদবার কেউ নেই। তাকে খোঁজবার কেউ নেই। এত বড় পৃথিবীতে সে একা। সে নিজেই নিজের। সে মরলে তারই শান্তি, তারই নিষ্কৃতি।

…মরতে যাচ্ছিল ব্রীজমোহন। মরতে গিয়েও বাঁচার পথ পেয়ে গেছে। মরার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে স্ত্রীলোকটিকে দেখার পর। ওর গয়না নজরে

আসার পর! এ গয়নার বখরা পেত সর্দার। কিন্তু পাবে না আর। তাকে তাড়িয়ে ভালই করেছে। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। অতগুলো গয়নার মালিক সে।

উন্মত্ত উল্লাস ব্রীজমোহনের ভিতর দাপাদাপি করছে। পৈশাচিক হাসি চাপতে পারছে না আর। মেঘ গর্জনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বিকৃত গলায় হা-হা করে অট্টহাসি হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সংশয়ের দোলায় দুলেও উঠল মন। এত আনন্দ করাটা কি ঠিক হচ্ছে। স্ত্রীলোক দেখা চোখের ভুল নয়তো?

ব্রীজমোহনের হাসির শব্দে বাজ পড়ল যেন দুকানের পাশে স্ত্রীলোকটির। চমকে উঠে ফিরে তাকাল। ফিরে তাকানো আর থমকানোর ধরণ দেখে ব্রীজমোহনের আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় হয়ে উঠল। স্ত্রীলোকটি মরীচিকা নয়, আলেয়ার আলো নয়। ভাগ্যলক্ষ্মী ছলনা করছে না তাকে। ওকে নিয়ে অনেক আশা বুকের তলায় বাসা বাঁধলেও বারে বারে ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য সংশয়েরও অন্ত ছিল না তার—সত্যি আসলে ও কি। সংশয়ের বীজ নির্মূল হয়ে গেছে একেবারে তার হাসির সময়। মানুষেরই মতো ওর ভয়ার্ত স্বর বেরিয়ে এসেছে গলা থেকে—কে?

দেখছে ব্রীজমোহন।

ভীত-চকিত স্ত্রীলোকটি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। কালবিলম্ব না করে ব্রীজমোহনও দৌড়তে লাগল পিছু পিছু।

পিছনে যাত্রীবোঝাই বাসটা এগিয়ে আসছে খুব দ্রুতগতিতে। সত্যবতীদের বাসকে ছাড়িয়ে যাবে। এ-বাসের ড্রাইভারও পিছনের ড্রাইভারের ঔদ্ধত্য মানবার পাত্র নয় গাড়ীর গতি বাড়িয়ে দিল আরো দ্বিগুণ।

দুটো বাসই নড়বড়ে ঝরঝরে। দু'গাড়ীর ভয়ে তটস্থ। অনিবার্য বিপদের হাত থেকে আজ আর রেহাই কেউ পাবে না বুঝি। কি কুক্ষণেই বাড়ীর বাইরে পা বাড়িয়ে ছিল তারা আজ। আকাশটা তো ভেল্কি খেলছে। মাঝে মাঝে ফুটো হয়ে যাচ্ছে। এই দুর্যোগে ড্রাইভারদেরও দুর্মতিতে পেয়ে বসেছে। দুটো গাড়ীতে পাল্লা দেওয়া-দিয়ি বন্ধ করতে বলেও কিছু হচ্ছে না। নিজেদের জিদ বজায় রাখতে ওরা অচল অটল। কার শক্তি কত বেশী—এই ঠুনকো ইজ্জত রাখতে গিয়ে এতগুলো লোকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে বসেছে ওরা। অনেকে নেমে যেতে চাইল। গাড়ী থামাল না ড্রাইভাররা ইচ্ছে করেই। নামতে দেবেনা কাউকে।

ওরা না থামতে চাইলে কি হবে—গাড়ী থামল। প্রথমটি আপনা হতেই আর দ্বিতীয়টি প্রথমটির পথ আটকে রেখেছে বলে। অবিশ্যি এ গাড়ীটা আপনা হতে না থামলে ও ড্রাইভার থামাতে বাধ্য হয়েছে উপায়ান্তর না দেখে।

যেখানে গাড়ী দুটো থেমেছে, তার আশপাশে জনবসতি নেই। কেবল খেজুর শাল শিরীষ গাছগুলো ছাড়া ছাড়া ভাবে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে। অন্য যাত্রীদের সঙ্গে বাস থেকে নেমে পড়ল সত্যবতীও।

সকলেই প্রমাদ গণল। গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারলে বাঁচে। ড্রাইভারের ইঞ্জিন সারানো হলে বাঁচে। একসঙ্গে বিপদে পড়লে বোধহয় শত্রুও মিত্র হয়ে ওঠে অন্ততঃ সে-সময়ের জন্য। এ ক্ষেত্রেও ঘটল তাই। অপর গাড়ীর প্রতিদ্বন্দ্বী ড্রাইভারটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এ গাড়ীর ইঞ্জিনে হাত লাগিয়েছে। তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে। ইঞ্জিনকে ঘিরে ইঞ্জিন সারানো দেখছে যাত্রীরা। কিছুক্ষণ বাদে বৃষ্টি আসতে সাত-তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে পড়তে লাগল যাত্রীরা। এই অবসরে তাদের পাশ কাটিয়ে অপর দিকটায় চলতে লাগল সত্যবতী। নজরে পড়ল না কোকারো। সত্যবতী চলেছে তো চলেছেই।

· ·পোড়া বাড়ীর কাছ বারাবর এসে থামল। এইখানে এসেছে বার দুয়েক সে ধরমলালের সঙ্গে। শেরঘাটি শহরে তার বাপের বাড়ী। যাবার সময় ঘরের গাড়ী করে·নিয়ে গেছে কতবার তাকে ধরমলাল এদিক দিয়ে।

জায়গাটা কেমন—দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল তার একবার। তারই অনুরোধে নামিয়ে চতুর্দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল ধরমলাল সেবারে। আর একবার কিছু না বলতেই এমনি নামিয়েছিল। এ জায়গাটা সত্যবতীর পরিচিত। হঠাৎ এ জায়গায় আসতে মন চাইল কেন সত্যবতীর? চাইবার কারণ আছে যথেষ্ট।

বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল সত্যবতী সবার অজ্ঞাতে। ধরমলালেরও। বাপের বাড়ীতে যাওয়াই স্থির ছিল গাড়ীটা থেমে যাওয়ার আগে পর্যন্ত। কিন্তু গাড়ীটা আকস্মিকভাবে থেমে যেতে মনের ও মতের পরিবর্তন হয়েছিল। অদম্য প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠেছিল ভিতরে ভিতরে। ধরমলালকে জব্দ করতে হবে। সত্যবতী জব্দ করবে। করবে, করবে।

অভিমানিনী সত্যবতীকে ঠিক চিনতে পারেনি ধরমলাল। বিয়ের বাইশ বছর পরেও না। প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি ভেঙেছে বার বার। সরাব ছাড়েনি।

দাদাশ্বশুর সরাবের তরল আগুনে জ্বলে পুড়ে মরেছে। শ্বশুরেরও দাদাশ্বশুরের অবস্থা হয়েছে শেষ অবধি। বিয়ের দু'বছর পরেই শ্বশুরের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখেছে সত্যবতী। স্বামীকে শত অনুরোধ উপরোধ করা সত্ত্বেও শ্বশুরেরই পথ অনুসরণ করে চলতে দেখেছে। পূর্বপুরুষদের মতো অকালমৃত্যু বরণ করে নিতে হবে স্বামীকে এটা দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়েছে। তাই এ বংশের এ অকাল মৃত্যুর অভিশাপ থেকে স্বামীকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ· চেষ্টা করেছে। শেষে

সরাব ছাড়াবার জন্য সরোষে বলেছে, সরাব ছাড়তে হবে, নয় আমাকে ভুলতে হবে।

চমকে উঠেছে ধরমলাল, হাত ধরে বলেছে, সরাব ছাড়বো। তোমাকে ছাড়তে পারবো না। প্রতিজ্ঞা করছি তোমার হাত ধরে—আজ থেকে ছোঁবো না আর। কথা রাখেনি ধরমলাল। বরং বাড়িয়েছে আরো। স্বামীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে সত্যবতী নির্বাক মুখে দিনের পর দিন। আর কিছু বলেনি। প্রতিজ্ঞার কথাও তোলেনি। তোলার প্রয়োজন বোধ করেনি। কিন্তু একদিন প্রয়োজন বোধ করতে হল তাকে ডাক্তারের কথা শুনে। নেশা না ছাড়ালে বাঁচানো দায়। লিভারটা যেতে বসেছে।

সত্যবতী ঘরে ঢুকে প্রতিজ্ঞার কথা ধরমলালকে স্মরণ করিয়েছে নতুন করে। আর নতুন করে আরো দু-একটা কথা শুনিয়েছে। গেলাসে হাত ঠেকাতে সত্যিই সে এবাড়ী ছেড়ে চলে যাবে।

কাজ হয়নি সত্যবতীর কথায়। গেলাসে হাত ঠেকায়নি শুধু ধরমলাল, ঠোঁটও ঠেকিয়েছে। ভিতরের উগ্র পানীয় গলায় ঢেলেছে। দেখেছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সত্যবতী। তারপর সবার অগোচরে বেরিয়ে গেছে বাড়ী থেকে।··· বাসে গিয়ে উঠেবে···বাসটা থেমে পড়তে দেখে পরিচিত জায়গায় এসে পৌঁছেছে।

এখানে পরিচিত ইঁদারার কথাটা কেবল মনে পড়েছে সত্যবতীর। ওর তলায় কেউ তাকে খুঁজতে আসবে না কোনোদিন এখানে। জব্দ হবে ধরমলাল। চিরদিনের মতো হারাতে হবে সত্যবতীকে। প্রতিশ্রুতি না রাখার ফল, সত্যবতীর কথা না শোনার ফল টের পাবে এবার।

ইঁদারার দিকেই এগোচ্ছিল হঠাৎ পিছন থেকে ব্রীজমোহনের হাসির শব্দে চমকে উঠে থমকে [illegible] একটু। কাউকে না দেখতে পেলেও ভেবেছিল, ধরমলালের কোনো খোশামুদে গাছের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। হয়তো বাড়ী থেকে বেরুবার মুখে দেখতে পেয়ে অনুসরণ করে আসছে তাকে। ধরে ফেলার ব্যঙ্গহাসির শব্দ এটা তারই। লোকটা কাছে এসে পড়ার আগে, ধরে ফেলার আগে সব শেষ হয়ে যাক তার।

ইঁদারা লক্ষ্য করে প্রাণপণে ছুটেছে সত্যবতী।

ছুটেছে ব্রীজমোহনও। ইঁদারাটা দেখতে পাচ্ছে সে-ও। কি সর্বনাশ! তার হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে ইঁদারার মধ্যে পড়ে যাবে যে এখুনি! ব্রীজমোহনের মাথায় ভিতর ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে সব। সে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। একি দেখছে! মা! মা ইঁদারায় ঝাঁপিয়ে পড়বে এখুনি। অস্ফুট

আর্তনাদ করে ওঠে ব্রীজমোহন। সে বেঁচে থাকতে মাকে এভাবে মরতে দেবে না কিছুতেই। কিছুতেই না। মুঠো থেকে খসে পড়ে গেল ছোরাটা মাটিতে।

তিনদিনের অনাহারী মানুষটার শরীরে আচমকা কি করে যে অত শক্তি এলো কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না। এক লাফে সত্যবতীর সামনে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে এলো ইঁদারা থেকে খানিক তফাতে।

সত্যবতী বেহুঁশ। মাথাটা লুটিয়ে পড়েছে ব্রীজমোহনের বুকের ওপর।

জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য সেবাশুশ্রূষা করার সময় বার বার ভেবেছে ব্রীজমোহন, দশ বছর বয়সে মা তার আত্মঘাতী হয়েছেন। বটগাছ তলার ইঁদারাটায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন নিশুতিরাতে। দারিদ্র্যের জ্বালা থেকে, বাবার নির্যাতন থেকে রেহাই পেয়েছেন মা। সেই মাকে আবার দেখল সে। স্পষ্ট দেখল।

জ্ঞান হতে সমস্ত ঘটনা শুনে, পরিচয় জেনে, সত্যবতীকে বাড়ী ফিরিয়ে এনেছে ব্রীজমোহন।

চায়ের নেমন্তন্নে এসে এতক্ষণ ধরে গল্পের মতো ব্রীজমোহন আর সত্যবতীর জীবন কথা শুনছিলুম আমি ধরমলালের মুখে ওদের বৈঠকখানায় বসে বসে। টেবিলে রাখা চায়ের কাপগুলোর ধোঁয়া ওঠা কখন যে বন্ধ হয়ে গেছে সে খেয়াল নেই আমাদের কারো। খেয়াল হল গোলাপী নেটের পরদা সরিয়ে, গরম চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে সত্যবতীকে ঘরে ঢুকতে দেখে।

একগাল হেসে টেবিলের ওপর ট্রেটা রাখল সত্যবতী। গরম চায়ের পেয়ালা দুটো এগিয়ে দিল আমাদের। আমাকে আর বন্ধুকে। ধরমলালের মুখের দিকে তাকিয়ে, তার পাশের চেয়ারে ব্রীজমোহনের দিকেও চেয়ে দেখলুম। আমার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে ওরা দুজনেই হাসল। প্রথম বারে চা দেবার সময় ওদের দিকে ফিরতে এই ভাবেই হেসেছিল দুজনে। তবে তখন ধরমলাল মুখে আঙুল চেপে চুপ থাকতে ইশারা করেছিল। এবারে আর তা করল না। একবার সত্যবতীর মুখের ওপর আর একবার ব্রীজমোহনের মুখের ওপর থেকে দু'চোখ ঘুরে এলো শুধু তার। তারপর নিঃসন্তান ধরমলাল মৃদু গলায় বলল, স্ত্রীকে আর ধর্মছেলেকে কাছে পাবার পর থেকেই সব নেশায়ই অরুচি আমার।

বীজমোহনের দিকে নজর পড়তে দেখলুম, অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে সে। সত্যবতীর মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি তার। কিন্তু সে যেন সত্যবতীকে দেখছে না। ওই মুখে তার নিজের মায়ের মুখই দেখছে বুঝি।

———